যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond





স্বাহা

প্রবাল

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্প্রতি খুব দামি একটা কথা বলেছেন। সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর প্রশ্ন ছিল, আপনি কি অসমকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবেন? হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উত্তর ছিল — না, আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি শুধু ব্যাপারটাকে একটা প্রজন্ম পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারি!

তাহলে? এক প্রজন্ম পরে কি সমগ্র পূর্ব ভারতজুড়ে হারমোনিয়াম আর তানপুরা ভাঙা শুরু হবে? ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া নিষিদ্ধ হবে? বাঙ্গালি মেয়েরা আর উৎসবে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পড়বে না, কালো বোরখার আড়ালে বন্দি হবে? আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কি আর নিজেদের সন্তানদের নাম বাংলাভাষায় রাখতে পারবে না? আর মাত্র একটা প্রজন্ম পরেই সব শেষ?

কে এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎকে প্রতিহত করতে পারে? কার সে ক্ষমতা আছে? কে পারে, অসম ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র পূর্ব ভারতকে, আমাদের অপৌরুষেয় সংস্কৃতিকে শুধু এক প্রজন্ম নয়, আগামী দশ প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত করতে? উত্তর একটাই — এই সমাজ। পথ — কনটেইনমেন্ট অ্যান্ড রোলব্যাক। যে পথের হদিশ ঋষি বঙ্কিম তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে রেখে গেছেন --'মুই হেঁদু!'

সমগ্র পুর্ব ভারতজুড়ে আজ কনটেইনমেন্ট পর্ব শুরু হয়ে গেছে। আমার ধারণা, এর পরের পর্যায়ে আসবে রোলব্যাক। শুধু ভূমি নয়, হৃত মানুষগুলোরও পুনরুদ্ধার। শত্রুপক্ষ কিন্তু চুপ করে বসে থাকবে না। তারাও দৃষ্টি রাখছে ঘটনাবলীর ওপর।

হাজার বছরের আগ্রাসন এবং তার বিপরীতে অপৌরুষেয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের সংকল্প ; আমার আজকের গল্প সেই দুই বিপরীত শক্তির ভবিষ্যৎ সংঘাত নিয়ে। এই গল্প আবর্তিত হয়েছে মূলত একটা ছোটো মেয়েকে ঘিরে। না, খুব ছোটো নয়, বয়ঃসন্ধির। আসলে, বয়স ব্যাপারটাই তো আপেক্ষিক, তাই না? কেউ পঞ্চাশেও দায়িত্ব নেয় না, আর কেউ-বা বয়ঃসন্ধিতেই পৃথিবীর গুরুভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়। চট্টগ্রামের পাহাড়ে টেগরা যখন ব্রিটিশ মিলিটারির সঙ্গে অসম যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল, সেও তো বয়ঃসন্ধিরই ছিল। এই কাহিনি বাস্তব-অনুপ্রাণিত হলেও পটভূমিকা, ঘটনাবলী, পরিস্থিতি ও চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ভৌগোলিক নামগুলি চেনা ঠেকলেও কোনো বর্তমান শাসক, রাজশক্তি বা চরিত্রের সঙ্গে মিল একান্তই অনভিপ্রেত। আজ থেকে আনুমানিক দশ বছর ভবিষ্যতে এ গল্পের যবনিকা উত্তোলন হলো বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলে।

প্রাচীন কর্ণফুলী নদী বরাবরই চট্টলা নগরীর সব কথা বুকে নিয়ে বয়ে চলে। আজও তার নিরলস কুলুকুলু ছন্দ অনেক কথা বয়ে নিয়ে চলেছে। সে বয়ে নিয়ে চলেছে নারকীয় গত দশ বছরের ইতিহাস। যে দশ বছরে ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করেছে একটি নতুন রাজনৈতিক পক্ষ — জামাত উল মুসলিমিন। বাংলাদেশ হয়ে গেছে পূর্ব খোরাসান। সরকারি পতাকায় ঘটেছে চাঁদ-তারার প্রবেশ। প্রাচীন ঢাকা নগরীর নাম বদলে হিন্দুহন্তা পীর শাহজালালের নামে রাখা হয়েছে শাহ্জালালাবাদ। আরও কত কী যে বদলে গেছে, তার হিসেব শুধুমাত্র মা কর্ণফুলীই রেখেছেন।



[চট্টলা, পূর্ব খোরাসান]

কর্ণফুলী নদীর মোহনায় মূল বন্দরের কর্মব্যস্ততার আড়ালে এমন কিছু নিরিবিলি কোণ আছে, যেখানে সময় যেন মরচে ধরা লোহার শিকলে আটকা পড়ে আছে। বিশেষ করে সীতাকুণ্ডের উপকূল ঘেঁষে গড়ে ওঠা বিশাল জাহাজভাঙার অংশটা, যেখানে পুরনো জেটিগুলো পচে গিয়ে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। লোনা জলের অবিরত ঝাপটায় কংক্রিটের বড়ো বড়ো পিলারগুলোর ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে অসংখ্য জংধরা লোহার রড, দেখতে অনেকটা মৃত ডাইনোসরের পাঁজরের মতো লাগে। বাতাসে এখানে সবসময় একটা ভারী গন্ধ ভাসে— পোড়া ডিজেল, লোনা জল আর বহু বছরের পুরনো স্তূপীকৃত লোহার মিশ্রিত কটু গন্ধ। জোয়ারের সময় যখন ঘোলাটে জল উপকূলে আছড়ে পড়ে, তখন বড়ো বড়ো পরিত্যক্ত জাহাজগুলোর গায়ে এক ভুতুড়ে গুমগুম শব্দ হয়। সেই সময় বিশাল জাহাজগুলোর গায়ের শ্যাওলার আস্তরণের ফাঁকে ফাঁকে খসে পড়া পুরোনো রঙের ছোপ স্পষ্ট দেখা যায়। লোনা বাতাসের ক্রমাগত কামড় তার একসময়ের উজ্জ্বল রংকে ভুলিয়ে দিয়েছে, সে রং ফিকে হয়ে কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিশালাকার সব নোঙর। এককালে জাহাজের সঙ্গী হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতো তারা। এখন মাটির গভীরে গেঁথে গিয়ে চিরতরে স্থবির হয়ে গেছে। পরিত্যক্ত কন্টেইনারগুলোর দরজা হাঁ করে খোলা, যেন তাদের ভেতরের অন্ধকার ক্ষুধিত শূন্যতা বিশ্বচরাচর গ্রাস করতে চাইছে। আধুনিক বন্দরের ক্রেনের যান্ত্রিক আওয়াজ এখান থেকে অনেক দূরে শোনা যায়, যা এই পরিত্যক্ত অংশটিকে আরও বেশি নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ণ করে তুলেছে। এ যেন এক যান্ত্রিক সমাধিস্থান, যেখানে মানুষের তৈরি বিশালাকার সৃষ্টি নীরবে ধুলো আর লবণের কাছে হার মানছে। কন্টেইনারের ওপর গজিয়ে ওঠা বুনো লতাগুল্ম লোহার খাঁজ বেয়ে ওপরে উঠে গেছে, যান্ত্রিক ধ্বংসস্তূপের মাঝে প্রকৃতির নীরব বিজয়কেতন। বিকেলের তপ্ত সূর্য যখন এই জরাজীর্ণ লোহার পাহাড়ের পেছনে হেলে পড়ে, তখন তাদের লম্বা ছায়াগুলো নদীর কর্দমাক্ত চরে তাদের লোভী হাত বাড়িয়ে দেয়, ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে।

তারপর নামে আঁধার। প্রেতপুরীর আঁধার।

আষাঢ় মাসের প্রথম রাত ছিল সেটা। সে রাতে দশদিক আঁধার করে বৃষ্টি এসেছিল। মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস, কুয়াশার বিভ্রম তৈরি করেছিল। কয়েক হাত দূরের দৃশ্য দেখা যায় না। চট্টলা শহরটাকে দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কুয়াশা ঢাকা নিভু নিভু এক শ্মশানের চিতা। পশ্চিম আকাশ জুড়ে জলভরা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মিটিমিটি জ্বলছে অসংখ্য লাল-নীল আলো, তুর্কির দান ব্যারাখতার ড্রোন, এসেছে চট্টলা থেকে কাফেরদের শেষচিহ্ন মুছে ফেলতে।

ব্যারাখতার ড্রোন। যেন যান্ত্রিক শকুন। আকারে ছোটো, খালি চোখকে ফাঁকি দিতে সক্ষম এই ড্রোন কুড়ি ঘণ্টা ধরে আকাশে ওঁত পেতে থাকে, শুধু কেউ একজন খোলা জায়গায় পা রাখার অপেক্ষায়। নিঃশব্দে নিখুঁত লেজার-গাইডেড মিসাইল দিয়ে আঘাত হেনে মুহূর্তে সবকিছু ছাই করে দেয়। মনে হয়, গোটা আকাশটাই যেন জেহাদি জল্লাদদের দখলে। অটোমান সাম্রাজ্যের যুগে তুর্কি খলিফার ইসলামি বিজয়ের ধ্বজাধারী অগ্রগামী সৈন্যদের বলা হতো 'ব্যারাখতার'। আজ ব্যারাখতার নামধারী মেড ইন তুর্কি ড্রোন সেই কাজই করে চলেছে পূর্ব খোরাসান জুড়ে।

প্রতিটি মসজিদের লাউডস্পিকার থেকে একই আওয়াজ ভেসে আসছে বারবার—' সমর্পণই ইসলাম। পবিত্রতাই ইসলাম। আল্লার জমি থেকে কাফের সাফ করো। আল্লাই মহান, আর কেউ নয়।' ভাঙা কন্টেনারের ধাতব দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে প্রহর গুনছিল মায়া। মুখ বিস্বাদ, জংধরা লোহার স্বাদ জিভে। কোমরবন্ধে বাঁধা রেডিয়ো ঘড়ঘড় শব্দে ফিসফিস করে উঠল, ''সামনে দু'টো ট্রাক, তার পেছনে একটা সাঁজোয়া গাড়ি, আর তার পেছনে আরও পাঁচটা ট্রাক!'' ঝড়ের গর্জনের মাঝে সেই ঘড়ঘড় শব্দ প্রায় শোনাই যায় না।

আজও প্রতি রাতে সেই দুঃস্বপ্নটা মায়াকে মাঝরাতে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। একরাশ ফুলের মতো শিশু পাগলের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। গায়ে তাদের জ্বলছে লেলিহান হুতাশন। ওরা পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে, কিন্তু পালানোর কোনো পথ নেই। কারণ, ওরা তো কাফের। ওরা হলো ওয়াজিব-উল-কতল।

মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটাকে দূরে সরিয়ে দিল মায়া। কোমরবন্ধ থেকে দেশি বন্দুকটা টেনে বের করল, ধাতব শরীরের শীতলতা আঙুল বেয়ে মেরুদণ্ডে উঠে শিহরণ জাগালো। আঙুল ট্রিগারে স্থির হতেই বুকের ভেতর ধুকপুক শব্দটা যেন আরও স্পষ্ট শোনা গেল, ঢাকের মতো বাজতে লাগলো কানের পর্দায়--- ধুকপুক-ধুকপুক-ধুকপুক। এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল ওর বাবার কথা। বাবা, তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে, বাবা! ঝড়ের গর্জনে বোবা চরাচরে মৃদু কম্পন ধরিয়ে মিলিটারি ট্রাকদুটো এগিয়ে এল গুদামের খোলা দরজা দিয়ে।

''ওঁম তারে তুত্তারে তুরে'' ফিসফিস স্বরে বলল মায়া।

''বজ্রজ্বল ফট্ ফট্'' ঘড়ঘড় শব্দে উত্তর দিল রেডিয়ো।

'রক্ষ রক্ষ স্বাহা!' হুঙ্কার দিল মায়া।

সেই উনিশশো তিয়াত্তর সাল থেকে শান্তিবাহিনী লড়াই করছে চট্টলার বৌদ্ধদের অধিকার রক্ষা করতে। সাফল্য আসেনি। কিন্তু এবার হয়তো সেটা বদলাবে।

বাইরে ঝড় মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে। সমুদ্রের লোনা বাতাসে কুয়াশা আর ডিজেলের গন্ধ মিশে একটা ভারী, দমবন্ধ করা আবহ তৈরি করেছে। দূরে মিলিটারি ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে; গভীর, যান্ত্রিক, যেন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কোনো আক্রমণোদ্যত জানোয়ার নিঃশ্বাস ফেলছে।

গুদামের বিশাল খোলা দরজা ঠেলে প্রথম ট্রাকটা ঢুকল। হেডলাইটের সাদা আলো ভাঙা কন্টেইনার আর মরচেধরা ক্রেনের কঙ্কাল ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তার পেছনে দ্বিতীয় ট্রাক। ছাদের ওপর বসানো ভারী মেশিনগানের মুখগুলো এদিক-ওদিক ঘুরছে।

ঠিক তখনই বন্দর শ্রমিকের পোশাক পরা দশটা ছায়ামূর্তি কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

প্রথম বিস্ফোরণটা হলো অস্বাভাবিক নিঃশব্দ। যেন কেউ অন্ধকারের বুকের মধ্যে চাপা একটা ঘুষি মেরেছে। তারপর— দুড়ুম!

প্রথম ট্রাকটা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে গেল। ধাতব শরীরটা মাঝআকাশে পাক খেতে খেতে উলটে গেল, তার ভেতর থেকে আগুন বেরোল; যেন গেরুয়া রঙের কোনো বিশাল ফুল ফুটেছে। আগুনের ঝলক এক মুহূর্তের জন্য পুরো গুদাম আলোকিত করে দিল। ছিটকে বেরিয়ে এল মানুষের হাত, রাইফেল, জ্বলন্ত কাঠের টুকরো।

দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা হলো আরও ভয়ংকর। চাপা বিস্ফোরণের তরঙ্গে গুদামের কাঁচগুলো একসঙ্গে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপরই অন্ধকারে জ্বলে উঠল লাল আর নীল অসংখ্য বিন্দু। ড্রোন।

কালো কাকের ঝাঁকের মতো সাঁজোয়া গাড়ির ছাদ থেকে উড়ে উঠল, ছড়িয়ে পড়ল গুদামের ছাদ জুড়ে। ধাতব ডানার গুঞ্জনে গুদামের বাতাস কেঁপে উঠল। প্রতিটা ড্রোনের নীচে লাল লেজার নাচছে— দেওয়াল, কন্টেইনার, ভাঙা সিঁড়ি, মানুষের লুকোনোর সম্ভাব্য প্রতিটা জায়গা স্ক্যান করছে।

'মায়া, পালাও!' রেডিয়োতে বোধিচিত্তর গলা কেঁপে উঠল স্ট্যাটিকের ভেতর।

কথা শেষ হওয়ার আগেই গুলির ঝড় শুরু হলো--- টা-টা-টা-টা-টা!

মেশিনগানের গরম সিসা গুদামের টিনের দেওয়ালে আঘাত করে আগুনের ফুলকি ছড়াতে লাগল। কংক্রিটের টুকরো ভেঙে উড়ে এসে মায়ার গালে গভীর ক্ষত দেগে দিল। ও ঝাঁপিয়ে পড়ল

উলটে যাওয়া ট্রাকটার পেছনে। ঠিক পরের মুহূর্তেই যেখানে ও দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে একঝাঁক গুলি এসে আঘাত করল একসঙ্গে।

ধাতব শব্দ। স্পার্ক। চিৎকার।

একজন সহযোদ্ধা দৌড়ে আশ্রয় বদলাতে গিয়ে বুকের কাছে গুলি খেল। শরীরটা ঝাঁকুনি খেয়ে পেছনে ছিটকে পড়ল। গরম রক্ত কংক্রিটের ওপর ছড়িয়ে গেল, মিশে গেল বৃষ্টির কাদাজলের সঙ্গে।

মায়া দাঁত চেপে শুয়ে পড়ল মাটিতে। গরম ধাতুর গন্ধ, বারুদের ধোঁয়া আর পোড়া মাংসের বীভৎস গন্ধে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ওর মনে পড়ে গেল শান্তিবাহিনীর সেই কমান্ডারের কথা— জামাতের সৈন্যরা প্রতিটা পরাজয় থেকে শিক্ষা নেয়। তাই প্রতিটা বিজয়ই ভবিষ্যতের ফাঁদ।

ঠিক তখনই—খচা-খচা-খচ! ব্লপ-ব্লপ-ব্লপ!

উপরে কোথাও থেকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের ফায়ারিঙের শব্দ ভেসে এল।

মায়া মাথা তুলে দেখল, ভাঙা ছাদের স্টিল বিমের ওপর কালো চিতাবাঘের মতো নীচু হয়ে একটা ছায়ামূর্তি বসে আছে। বজ্রপাতের আলোয় এক ঝলক দেখা গেল তার চোখ। তার রাইফেল আগুন ছুঁড়ছে। প্রতিটা শট হিসেবি। ঠাণ্ডা। নিখুঁত।

একটা ড্রোন মাঝ-আকাশে বিস্ফোরিত হলো। আরেকটার প্রপেলার ছিটকে বেরিয়ে গেল। তৃতীয়টা দেওয়ালে আঘাত করে আগুনের গোলায় পরিণত হলো। আকাশ থেকে পাকা ফলের মতো ঝরে পড়তে লাগল ড্রোনগুলো।

সুযোগটা নিল মায়া। বুক মাটিতে ঠেকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। মাথার ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে গুলি উড়ে যাচ্ছে। একবার একটা গুলি এত কাছে দিয়ে গেল যে ওর কানের পাশের চুল উড়ে গেল বাতাসে। সাঁজোয়া গাড়িটার নীচে পৌঁছাতেই ও কোমর থেকে বোমাটা বের করল। হাত কাঁপছে। কিন্তু আঙুল স্থির।

লোহার গায়ে চুম্বক লাগার ঠাস শব্দ। ক্লিক! টাইমার অন।

ঠিক তখনই গাড়ির উল্টো পাশ থেকে একটা সৈন্য নীচু হয়ে ওর দিকে তাকাল। চোখাচোখি হয়ে গেল।

সৈন্যটা চিৎকার করে উঠল, ''ওখানে—!''

মায়া আর এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট করল না। পাকসাট খেয়ে পাশের কংক্রিটের স্তম্ভের পেছনে গড়িয়ে পড়ল। সৈন্যটা গুলি চালাল। গরম সিসা মাটিতে আঘাত করে কংক্রিটের টুকরো ছিটকে দিল।

মায়া কোমর থেকে দা টেনে বার করে সৈন্যটার হাঁটুর পেছনে বসিয়ে দিল। লোকটা আর্তনাদ করে পড়ে যেতেই তার রাইফেল ছিনিয়ে নিল, খুব কাছ থেকে ট্রিগার টিপল।

ধপ্! লোকটার শরীর নিস্তেজ হয়ে গেল।

তারপর—- সাদা আলো। কান ফাটানো বিস্ফোরণ।

সাঁজোয়া গাড়িটার ভেতর থেকে আগুন ফুলে উঠল, যেন ধাতুর তৈরি দানবের পেট ফেটে সূর্য বেরিয়েছে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে পুরো গুদাম কেঁপে উঠল। স্টিল বিম ভাঙল। কন্টেইনার উলটে পড়ল। ওপরের ছাদ গর্জন করে ধসে নামতে লাগল।

আলোর বিপরীতে সেই ছায়ামূর্তি ছাদ থেকে লাফ দিল। বিশাল শরীর। হাতে ধোঁয়া ওঠা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। মাঝ-আকাশে ঘুরে পড়ে হাঁটু গেড়ে অবতরণ করল।

ইতিমধ্যে মায়ার সহযোদ্ধারা আক্রমণ করেছে অন্য ট্রাকগুলোকে। বন্দরের অন্ধকার জুড়ে একটার পর একটা বিস্ফোরণ ফুলের মতো ফুটে উঠছে। পাহাড় কেঁপে উঠছে। সমুদ্রের কালো জল থরথর করছে। ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে গুলির শব্দ আর মানুষের আর্তনাদ মিশে গিয়ে মনে হচ্ছে— পুরো পৃথিবীটাই যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

চামড়ার ফিতেয় বাঁধা AK-203 রাইফেলটাকে পিঠের দিকে ঠেলে দিল ছায়ামূর্তি। ''কর্নেল থুরা ওয়াই সান, আরাকান আর্মি!'' স্যালুটের সঙ্গে নিজের পরিচয় দিল ছায়ামূর্তি। উচ্চারণে রাখাইনের ছোঁয়া। গুদামে তখন দাউদাউ আগুন জ্বলছে। সে আগুন একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে বন্দর জুড়ে।

ভোরের দিকে বৃষ্টি ধরে এল, পেছনে ফেলে রেখে গেল ধোঁয়াশা। দূরে বন্দরের কিনারায় বসে নজর রাখছিল মায়া। ধ্বংসপ্রাপ্ত গুদামের মাঝে সাতটা ট্রাক আর একটা সাঁজোয়া গাড়ি তখনও উলটে পড়ে আছে, সামুদ্রিক পাখি আর শকুনের ভোজ লেগেছে সেখানে। ট্রাকগুলো থেকে মালপত্র উদ্ধার করছিল মায়ার সহযোদ্ধারা— বোধিচিত্ত, অমিতাভ, মৈত্রী আর বাকিরা। আহতদের ব্যান্ডেজ করছিল নীলা। গুদামের দিক থেকে বাতাস বইছে, বয়ে আনছে মৃত্যুর দুর্গন্ধ। পোড়া ডিজেল আর রক্তের গন্ধে বমি উঠে আসে। নাকে রুমাল চেপে ধরে সে গন্ধ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল মায়া। গতরাতের আগন্তুক কিন্তু নির্বিকার চিত্তে নিজের AK-203 পরিষ্কার করে চলেছে। চট্টলা পাহাড়ের মতোই স্থির, দৃঢ়। ক্ষতবিক্ষত তার মুখের গড়ন। দৃষ্টিতে কমলা আভা, সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

'রাজধানী শাহ্জালালাবাদ থেকে সাতটা ট্রাক এসেছে, তার মধ্যে পাঁচ ট্রাক ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র, এর বেশিরভাগটাই যাচ্ছিল পার্বত্য চট্টলার বান্দরবানে, ''বলল মায়া'', 'সেখানকার জামাতের ডেরায় পৌঁছে গেলে পাহাড় জুড়ে গণহত্যা শুরু হতো। বাকি দুটো ট্রাকে রয়েছে ব্যাটল গিয়ার আর ইলেকট্রনিক্স। এগুলো সবই আমাদের কাজে লাগবে।'

''তোমাদের আক্রমণের কায়দাটা ভালোই ছিল'', বলল লোকটা, ''কিন্তু কাজটা শেষ করতে বড্ড সময় লাগিয়ে দিলে। আরও ক্ষিপ্র হতে হবে। পাকতে আরও সময় লাগবে তোমাদের।''

''ভালো করে পাকার মতো সময় আমাদের হাতে নেই,'' মাথা নেড়ে বলল মায়া, ''পূর্ব খোরাসানের মিলিটারির একটা বড়ো অংশ

তুর্কি ও ইজরায়েলের যুদ্ধে তুর্কিকে সাহায্য করতে গেছে। বিদ্রোহের এরকম সুযোগ আর পাবো না, কর্নেল থুরা ওয়াই সান। আপনার নাম আমি লোকমুখে শুনেছি। কোত্থেকে এলেন আপনি? বুঝতেই পারিনি। আপনার পদবিটা কিন্তু অদ্ভুত। বর্মা মুলুকের লোকেদের মধ্যে এরকম পদবি আগে কখনো শুনিনি। শুনেছি, জাপানে লোকের নামের পেছনে 'সান' জুড়ে দেয়, সম্মান দিতে। বর্মায় সেরকম কোনো রীতি আছে কি?"

"আমার ঠাকুর্দা বলতেন," প্রসঙ্গ ঘোরাতে বলল থুরা, "ইংরেজ গেছে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়নি। ঠিকই বলতেন!"

"শেষ হয়নি," বলল মায়া, "তার মানে এই নয় যে যুদ্ধ আর কখনো শেষ হবে না। হয়তো এ যুদ্ধ শেষ করার দায়িত্ব তথাগত আমাদের ওপরই ন্যস্ত করেছেন!"

"আরাকান আর্মি আমাকে পাঠিয়েছে," বলল থুরা, "চট্টলায় যা হচ্ছে, তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া, জামাতের আগামী লক্ষ্য রাখাইন। সেটা আমরা হতে দেব না। চট্টলার এখন দরকার একটা দাবানল। আর পাহাড়ের বিদ্রোহীদের দরকার একজন শিক্ষাগুরুর।"

উত্তর দেবার সুযোগ পেল না মায়া, তার আগেই ওর রেডিয়ো ঘড়ঘড় করে উঠল। ওপার থেকে স্বর ভেসে এল, "দক্ষিণদিক থেকে দুটো আর্মি পেট্রল আসছে।"

চমকে উঠে দাঁড়ালো মায়া। থুরা তখনও নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছে উদীয়মান সূর্যের দিকে।

"সেই আদিম কাল থেকেই মানুষ শিখেছে," বলল মায়া, "রাত মানে বিপদ, আর দিন মানে বিপদমুক্তি। আপনার দেশেও বোধহয় সূর্যোদয় মানেই নিরাপত্তা, তাই না? আমাদের এখানে কিন্তু সূর্যোদয় মানে বিপদ। সূর্য উঠলেই তো আর্মি পেট্রলিং জোরদার হয়।"

আগ্নেয়াস্ত্রে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো থুরা। তারপর একটু ভেবে বলল, "গতরাতে কি প্রথমবারের মতো মানুষ মারলে তোমরা?"

চমকে তাকালো মায়া। এরকম প্রশ্ন ও প্রত্যাশা করেনি। থুরা আবার বলল, "আজ রাতে তোমাদের ঘুম হবে না। ক্ষিদে চলে যাবে। বারবার বমি পাবে। দ্বিতীয়বার যখন মানুষ মারবে, তখন প্রতিক্রিয়াটা একটু সহজ হবে। শেষমেশ ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে যাবে। আর এই জিনিসটাই হবে সবচেয়ে বিপজ্জনক। তোমাদের শত্রুদের মতোই তোমরাও খুনি হয়ে যাবে। মানুষ আর থাকবে না। সেই পরিস্থিতিতেও মনুষ্যত্ব টিকিয়ে রাখাটাই তোমার দলের আসল লড়াই। দলনেত্রী হিসেবে এটার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।"

"কিন্তু...কীভাবে সেটা..." কথা শেষ করার সুযোগ পেল না মায়া। দূর থেকে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। নাকের ওপর রুমালটাকে কষে বেঁধে নিল মায়া। এক ঝলক দেখে নিল, আর সবাই চলে গেছে ওখান থেকে। বন্দর থেকে একটা ড্রেনপাইপ চলে গেছে পূর্বদিকে, পাহাড়ের দিকে। ওরা যেখানে বসে ছিল, সেখান থেকে আন্দাজ পঞ্চাশ মিটার হেঁটে গিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনা সরিয়ে মায়া ঝাঁপ দিল তার ভেতরে। অন্ধকার সেই বিবরে পূতিদুর্গন্ধ কাদা, কিন্তু এই ম্যানহোলের অন্য প্রান্ত গেছে পাহাড়ের ঘেরাটোপের মধ্যে, জঙ্গলের মায়াঘেরা নিরাপত্তায়।



তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে, বাবা?

বিশাল একটা পাথরের ওপর বসে পা থেকে জোঁক ছাড়াচ্ছিল মায়া। দূর থেকে কোনো মন্দিরের ঘণ্টার সুরেলা শব্দ ভেসে আসছে। বাতাসে জুম চাষের পোড়া গন্ধ। আজ বারবার সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। পাহাড়ের সর্পিল পথ বেয়ে যখন রাঙ্গুনিয়া পাহাড়ের একদম চূড়ায় এসে পৌঁছেছিল, আজকের মতোই তখন ভোরের কুয়াশা সবেমাত্র কাটতে শুরু করেছে। সোনালি কাজকরা ভারী কাঠের ফটকটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে চমকে গেছিল মায়া। প্রথমবারের মতো এত বড়ো কোনো বিহার দেখল ও। সোনালি প্যাগোডার দিকে তাকিয়ে ওর বড়ো বড়ো চোখদুটো বিস্ময়ে আরও ডাগর হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, কোনো এক জাদুকর যেন মহাশূন্য থেকে এই আকাশচুম্বী সোনার প্রাসাদটাকে নামিয়ে এনেছে, বসিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের সবুজ রঙের ওপর। এখান থেকে কি আকাশ ছোঁয়া যায়? মায়া প্রশ্ন করেছিল বাবাকে। উত্তরে বাবা হেসে ওর মাথায় হাত রেখেছিল। সেই আদুরে স্পর্শে মনে হয়েছিল, এটাই দুনিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

বিহারের ভেতর পা রাখতেই স্নিগ্ধ এক নিস্তব্ধতা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। চারদিকে ধূপের মিষ্টি ঘ্রাণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মন্ত্রোচ্চারণের মৃদু গুঞ্জন। মাঝখানে বিশাল বুদ্ধমূর্তি, হলঘর ঘিরে একুশটি তারাদেবীর মূর্তি। সামনে রাখা প্রদীপের শিখাগুলো মৃদু বাতাসে দুলছে। আলতো করে বাবার গায়ের চাদরটা টেনে ধরেছিল মায়া। ভগবান বুদ্ধের বিশাল মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বাবা, আমাদের স্কুলের কয়েকজন ছাত্র আমাকে টিটকিরি করে বলে যে, আমরা কাফের। আমরা মূর্তিপূজা করি, সেটা নাকি মিথ্যে, সেটা বোকামি, পাপ। ওরা বুদ্ধকে বলে বুৎ, ওরা বলে বুৎপরস্তি হলো গুনাহ।"

বাবা হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই কী মনে করিস?"

"আমি জানি না," বলেছিল মায়া, "শুধু এটুকু জানি যে, ভগবান বুদ্ধের মুখের দিকে তাকালে মনে শান্তি আসে।"

"ভেবে নে, সেটাই আসল কথা," বলেছিল বাবা, "মানুষের মনটাই হলো মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু, আবার সবচেয়ে বড়ো বন্ধুও বটে। মানবসভ্যতা আগামী ধাপের দিকে এগোবে, মানুষের

বুদ্ধি বোধিতে রূপান্তরিত হবে নাকি মানুষেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু নির্ভর করছে মানুষের নিজের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার ওপর। সেই জন্যই তো আমরা বড়ো বড়ো বুদ্ধমূর্তি বানাই। যাতে সবার চোখে পড়ে, সবার মনে শান্তি আসে। মনটাকে দুঃখ রহিত রাখাটাই আসল সাধনা। ওই দ্যাখ, মা তারার মূর্তি। মায়ের বাঁ-হাতের ভঙ্গিটা খেয়াল কর। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে। এটার মানে জানিস? তর্জনী হলো ধীশক্তির প্রতীক, আর বুড়ো আঙুল আবেগের প্রতীক। মা তারা ওই ভঙ্গির মাধ্যমে আমাদেরকে বলছেন, আমাদের ধীশক্তি আর আবেগ যেন সবসময় একে অপরের সঙ্গে কাজ করে। দু'জনের মাঝে যেন কোনো বিরোধ না থাকে, একজন যেন অন্যজনকে দাবিয়ে না রাখে। এখন থেকে যখনই মা তারার মূর্তি দেখবি, এই কথাটা তোর মনে পড়বে, তাই না?"

"আর বাকি তিনটে আঙুল?" কৌতূহলী মায়া প্রশ্ন করেছিল, "দেখে মনে হচ্ছে, মা যেন তিন আঙুল দেখিয়ে আমাদেরকে তিন নম্বরটা বলছেন— এক দুই তিন!"

"সত্যিই তাই," বুঝিয়ে বলেছিল বাবা, "তিন সংখ্যাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ত্রি-মূল, ত্রি-কায়া, ত্রি-বজ্র, ত্রি-তাপ। ত্রি-নাড়ি অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না। ত্রি-শক্তি অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। আবার এই ক্ষেত্রে তিন মানে— বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘ। এখানে বুদ্ধ মানে একটা গুণ, আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে বোধির স্তরে নিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধ হওয়ার সাধনা।"

"ধর্ম আর সঙ্ঘ?"

"পরে বলব, আগে চল, এখানে বসে কিছুক্ষণ ধ্যান করি?"

ধ্যান, তারপর ভিক্ষুদের সঙ্গে মিলে মন্ত্র উচ্চারণ আর শেষে ভিক্ষুদের উপদেশ শোনার পর খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল। মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে বসতেই ভিক্ষুরা খাবার এনে দিয়েছিল। কলাপাতায় মোড়া লাল ভাত, ডাল আর পাহাড়ের ঢালে জন্মানো তেতো-মিষ্টি শাকসবজির চচ্চড়ি। অন্নকে সম্মান জানিয়ে ছোট্ট প্রার্থনা সেরেই খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মায়া। মনে হয়েছিল যেন অমৃত।

শেষে বিহার থেকে যখন বেরোনোর সময় হলো, বিকেলের তপ্ত সোনা রোদ তখন বিহারের কারুকাজ করা ছাদের ওপর এলিয়ে পড়েছে। চারপাশটা যেন খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছিল। মায়ার মনে হয়েছিল, এই পাহাড়, এই সোনালি বিহার আর ওর বাবার হাত, সব মিলেমিশে এক রূপকথার জগৎ তৈরি করেছে। শান্তির জগৎ, এখানে ভয় শব্দটাই অর্থহীন।

শান্তির সেই সোনালি স্বর্গ মুহূর্তে এক বীভৎস কসাইখানায় পরিণত হলো। মিলিটারির লোকজন বিহারের একমাত্র প্রবেশদ্বার সেই ভারী কাঠের ফটকটাকে সশব্দে বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। তার সঙ্গেই উপত্যকা থেকে বাইরে বেরোনোর সব পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল। যে নিস্তব্ধতা একটু আগে পবিত্র মনে হয়েছিল, তা মুহূর্তে হিমশীতল আতঙ্কের রূপ নিল। অবাক মায়া দেখেছিল, ভালোবাসা আর নিরাপত্তায় ভরা বাবার সেই হাত এখন কাঁপছে। রাজধানী শাহ্জালালাবাদ থেকে সদ্যপ্রেরিত জেনারেলের নির্দয় ইশারায় সৈন্যরা চারপাশ থেকে বিস্ফোরক ছুঁড়তে শুরু করল, পাহাড়ের আদিম নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে ভেঙে গেল গ্রেনেডের বিকট গর্জনে। যে আঙিনায় একটু আগেও ধূপের মিষ্টি গন্ধ ভাসছিল, সেখানে এখন শুধুই পোড়া মাংস আর বারুদের কটু গন্ধে ভারী বাতাস। চোখের সামনে দেখল মায়া, সোনালি প্যাগোডার কারুকাজ করা দেওয়ালগুলো আগুনের লেলিহান শিখায় কালো হয়ে ধসে পড়ছে। যে বুদ্ধমূর্তির শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ও শান্তি খুঁজছিল, সেই মূর্তির ওপর বৃষ্টির মতো আছড়ে পড়ছে কংক্রিটের টুকরো। চারদিকে আর্তনাদ আর বাঁচার আকুতি, কিন্তু বেরোনোর কোনো পথ নেই। ইঁদুরকলে আটকে পড়া নিরপরাধ মানুষগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাবার চওড়া বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে কুঁকড়ে ছিল মায়া। ও ভাবতো, বাবা সব পারে। কোনো বিপদই বাবাকে ডিঙিয়ে ওর কাছে আসতে পারবে না। কিন্তু তা তো হলো না। খুব অবাক হয়েছিল মায়া। বাবার সেই চওড়া বুক বুলেট বা বোমার আঘাত রুখতে পারছে না। যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধীর পদচারণা সময়কে থামিয়ে দিয়েছিল, তাদের রক্তে এখন বিহারের শ্বেতপাথরের মেঝে লাল হয়ে উঠেছে। প্রদীপের সেই পবিত্র শিখাগুলো এক বিশাল সর্বগ্রাসী অগ্নিকুণ্ডের রূপ নিয়েছে। শান্তির মায়াবী সেতু এখন নরকের এক গহ্বর। শেষ যে দৃশ্যটা মনে আছে সেটা হলো, জেনারেল রহমান পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে নির্বিকার চিত্তে দেখছে, কীভাবে পৃথিবীর সব ভক্তি আর ভালোবাসা একসঙ্গে মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। মুখমণ্ডলে নির্লিপ্ত ক্রূর এক হাসি। শেষ স্মৃতি হয়ে রইল বাবার সেই শক্ত আলিঙ্গন, আগুনের উত্তাপে সে আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে।

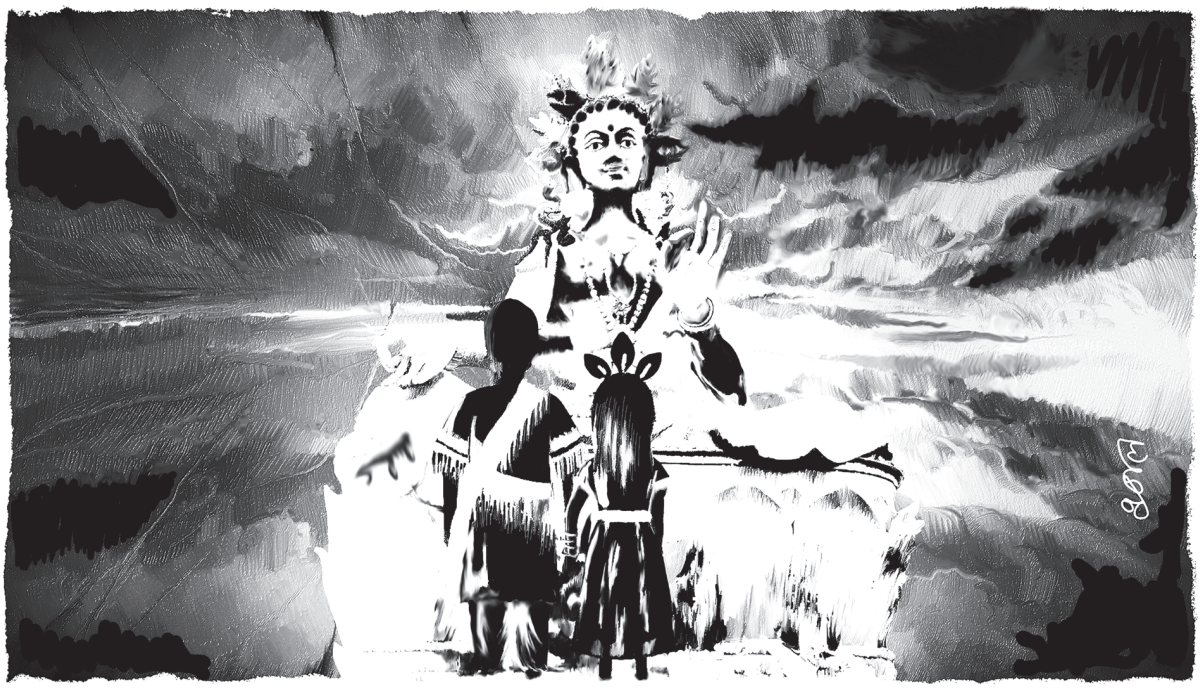
বাবা... বাবা... তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে, বাবা?

পা থেকে জোঁক ছাড়ানো শেষ করে উঠে দাঁড়ালো মায়া। জঙ্গলের গভীরে ওর আজকের আস্তানার দিকে হাঁটতে শুরু করল।



আষাঢ় মাসের সেই প্রথম রাতটার পর প্রায় মাস তিনেক কেটে গেছে।

চট্টলার ভূপ্রকৃতি ও সমাজবিন্যাসকে মূলত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়— পার্বত্য ও সমতল বা সমুদ্র উপকূল। আজ থেকে তিনমাস আগে লড়াইটা হচ্ছিল মূলত পার্বত্য চট্টলাতে, যেখানে আজও বৌদ্ধ চাকমারা সংখ্যাগুরু। সামরিক বাহিনীর সাহায্যে



জামাতের সশস্ত্র জেহাদি বাহিনী যখন তখন বৌদ্ধ পরিবারগুলোকে আক্রমণ করতো। ছেলেদের কুপিয়ে বা আগুনে জ্বালিয়ে মারতো, মেয়েদের বেঁধে নিয়ে যেত যৌনদাসী বানাতে। সেসব দৃশ্য মোবাইলে ভিডিয়ো তুলে ছড়িয়ে দিত, মুসলমান যুবকরা যাতে জামাতের বাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহ পায়। চাকমারা প্রতিরোধের চেষ্টা করলে সেখানে পৌঁছে যেত মিলিটারি আর তাদের ড্রোন। পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিল চাকমারা।

আর সমতলে? সমুদ্রসৈকত জুড়ে শুধুই ছিল জামাতিদের আস্ফালন। অপ্রতিরোধ্য।

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। ওই অস্ত্রই দেশজুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। আষাঢ় মাসের প্রথম রাতে মায়ার উদ্ধার করা পাঁচ ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র সেই ভূমিকাই নিল চট্টলার বিদ্রোহে। দিকে দিকে সরকারি আর জামাতের লোকেদের ওপর আক্রমণ শুরু হলো। গত তিনমাসে বোধহয় একটা দিনও যায়নি, যেদিন বড়সড় কোনো আক্রমণ হয়নি। পাওয়ার স্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সরকারি অস্ত্রাগার— কিছুই বাদ যায়নি। শহর আর গ্রামের অলিতে-গলিতে লড়াই হয়েছে জামাতের লোকেদের সঙ্গে। পরনে সাদা টুপির সঙ্গে বড়দার জামা আর ছোটভাইয়ের পাজামা, এই কিম্ভূত জীবগুলো এককালে দাপিয়ে বেড়িয়েছিল সর্বত্র, এদের কথাই ছিল আইন। বিদ্রোহীদের হাতে অস্ত্র আসার সঙ্গেই সময় বদলে গেছে।

পাহাড়ের আকাশে এখনো ড্রোনের দাপট, কিন্তু পাহাড়ের মাটি এখন মুক্তাঞ্চল। শাহ্‌জালালাবাদের মিলিটারি সেখানে ঢোকার সাহস পায় না। কিন্তু সমতলে লড়াই এখনো চলছে সমানে সমানে। ইতিমধ্যে ক্রমাগত আক্রমণে কোণঠাসা জামাতের বাহিনী একে একে পালিয়ে গেল চট্টলা ছেড়ে, নোয়াখালি পার হয়ে কুমিল্লায় গিয়ে জড়ো হয়েছে তারা। লড়াইয়ের ভার তারা রেখে গেছে সরকারি বাহিনী আর তাদের ব্যারাখতার ড্রোনদের ওপর।

ড্রোনবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করা খুব কঠিন। তারা সর্বব্যাপী, সবজায়গায় তাদের চোখ। এই ড্রোনগুলির জন্যই বিদ্রোহীদের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে প্রচুর। মায়া পরিষ্কার বুঝতে পারলো, ড্রোনবাহিনীকে নিরস্ত্র না করতে পারলে, আকাশের দখল না নিতে পারলে স্বাধীন চট্টলার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

সমতলে বিদ্রোহে একটা নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। 'চট্টলা এক্স-মুসলিম ফেডারেশন' নামের এক সংগঠন, যারা এতকাল লুকিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার অন্তরালে থেকে জামাতিদের বিরুদ্ধে মূলত বৌদ্ধিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, ইসলাম-ত্যাগীদের এই সংগঠনের লোকেরা ইতিমধ্যেই চাকমা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই আছে, যারা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মী। তাদের কেউ বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে যোগ দিয়েছে, কেউ-বা গোপনে সরকারের অন্দরমহলের খবর পৌঁছে দিচ্ছে মায়ার কাছে।

বর্ষাঋতু শেষ হলেও মৌসুমী বায়ু এখনো বিদায় নেয়নি চট্টলা থেকে। কাল সারারাত অঝোরধারে বৃষ্টি হয়েছে। ভোররাতে বৃষ্টি ধরেছে, কিন্তু বাতাসে এখনো ভেজা জঙ্গলের ঘ্রাণ। কাদামাটির রং গাঢ় হয়েছে। পাহাড়ের ওপর থেকে চট্টলা বন্দরকে দেখে মনে হচ্ছে যেন নিভু-নিভু একটা কাঠের উনুন। ঘন ধোঁয়াশার মধ্যে মিটমিট করা সঞ্চারমান আলোর বিন্দু, মরণাগত পাওয়ার স্টেশনের শেষ আলোর ঝলক, মিলিটারি পেট্রোলের আলো, ড্রোনবাহিনীর

লাল-নীল চোখ।

বান্দরবানের মেঘ-ছোঁয়া পাহাড়ের একদম নির্জন এক খাঁজে লুকিয়ে থাকা এই পরিত্যক্ত আস্তানাটা যেন এক বিষণ্ণ ইতিহাসের কঙ্কাল। ঘন বাঁশঝাড় আর বুনো ফার্নের আড়ালে মাচাং ঘরটি এমনভাবে মিশে আছে যে, কয়েক ফুট দূর থেকেও একে চেনা অসম্ভব। এ যেন পাহাড়ের বুকের এক গোপন ক্ষত। বহু বছর আগে জেহাদিদের ভয়ে ফেলে যাওয়া এই কুটিরটির বাঁশের খুঁটিগুলো এখন উইপোকায় খেয়ে জীর্ণ করে ফেলেছে। ঘরের মাচা বা মেঝেটা জায়গায় জায়গায় ধসে পড়েছে, সেখানে জমছে ঝরাপাতার স্তূপ আর স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলা। ঘরের ভেতরটা সবসময় এক গুমোট অন্ধকারে ডুবে থাকে। এক কোণে পড়ে আছে একটা পুরনো কাঠের গুঁড়ি, গায়ে গভীর ক্ষতের মতো ফাটল ধরেছে। মাটির উনুনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, তার পাশে পড়ে আছে একটা জংধরা টিনের মগ, যার তলায় ফুটো, সময়ের বালুরাশি জমে আছে ভেতরে। দেওয়ালের পচা বাঁশের চটা বেয়ে বুনো লতা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এ এখন আর কারোর সুখী গৃহকোণ নয়, বান্দরবানের এই গহীন অরণ্যের এক নিঃসঙ্গ ধ্বংসস্তূপ, যা সময়ের সঙ্গে পচে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

সেই ঘটনাটার পর আর ঘরে ফেরা হয়নি মায়ার। খুব ইচ্ছে হয় একবার গিয়ে দেখতে, সব ঠিক সেরকমই আছে কিনা। তারপরেই ভয় করে। বাবা তো সেই আগের মতো ঘরের জানালার পাশে বসে নেই। ফাঁকা বাড়ির নির্মম দৃশ্য কি ও সহ্য করতে পারবে? মাথা নেড়ে ঘরের বাইরে বেরোলো মায়া। সেখানে আগুন জ্বলছিল, কাঁচা বাঁশের চোঙের ভেতর ঝরনার জলে পাহাড়ি চায়ের কাঁচা পাতা ফুটছিল। কাঠের একটা মগে কিছুটা চা ঢেলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো মায়া। ফাটা কাঠের গুঁড়ির ওপর মেলে ধরে নিবিষ্টমনে একটা মানচিত্র দেখছিল থুরা। বন্দরের মানচিত্র, সেখানে লাল কালিতে দাগ দেওয়া আছে সেই জায়গাগুলো, যেখান থেকে ক্রমাগত ড্রোন আক্রমণ হচ্ছে। তার পাশে কালো কালিতে তালিকা করা আছে, কোন কোন সময়ে ড্রোন আক্রমণগুলো হচ্ছে। এর সঙ্গেই, হলুদ কালিতে আঁকা আছে, ড্রোনগুলো কোন পথ ধরে আসে।

''একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে,'' হাতের ধোঁয়া ওঠা মগটাকে গুঁড়ির ওপর রেখে বলল মায়া, ''ড্রোনগুলো ঠিক রাত বারোটা নাগাদ চট্টলা ক্যান্টনমেন্ট, মানে চট্টলা দুর্গের দিকে যায়। এটা একটা কমন প্যাটার্ন। তার মানে কী?''

''পাখি যতই আকাশে উড়ুক,'' বলল থুরা, ''দিনের শেষে বাসায় ঠিকই ফেরে। তার মানে, এই ব্যারাখতার-পাখির বাসা হলো চট্টলা দুর্গ। তুমি তো জানো, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই চট্টলা দুর্গের একটা ভূমিকা ছিল। আজ সেই দুর্গই সম্ভবত ওদের ড্রোনবাহিনীর কমান্ড সেন্টার।''

''আরও একটা ব্যাপার,'' বলল মায়া, ''দেখা যাচ্ছে, রাত ঠিক বারোটা পঁয়তাল্লিশ থেকে একটা পনেরোর মধ্যে কোনো ড্রোন-হামলা হয় না। কেন? ওই সময় কি ড্রোনগুলো মেন্টেনেন্সট মোডে থাকে? মেরামত, ব্যাটারি চার্জিং— এসব কি ওই সময় হয়?''

''সম্ভবত,'' বলল থুরা। তারপর মায়ার চায়ের মগটা গুঁড়ির ওপর থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখলো। সাবধানে জামার আস্তিন দিয়ে চায়ের দাগটা মুছে ফেলল গুঁড়ির ওপর থেকে।

''কী হলো?'' অবাক হলো মায়া, ''চায়ের মগটা কী অসুবিধে করছিল এখানে?''

''পাহাড়ি গ্রিন টি,'' গম্ভীর মুখে বলল থুরা, ''স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। কিন্তু কাগজের পক্ষে মোটেই ভালো না। ম্যাপে চায়ের দাগ লাগলে সেটা দেখতে খুব খারাপ লাগতো।''

রাগতে গিয়েও হেসে ফেললো মায়া, ''আপনি বড্ড সাবধানি মানুষ তো!''

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা দমকা বাতাস ওপরের দিকে ধেয়ে এল। জরাজীর্ণ ছাদের ছনগুলো খসখস শব্দ করে উঠল, শুনতে অনেকটা অশরীরীর ফিসফিসানির মতো লাগল। জানালার ভাঙা ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো মেঝেতে পড়েছে, ধূলিকণাগুলো সেখানে আনন্দে নাচছে। মনে করিয়ে দেয় যে, এখানে একসময় এক সুখী স্বচ্ছল জীবন ছিল। এখন সেখানে শুধু পাহাড়ি নির্জনতা আর মাঝে মাঝে কোনো বুনো জানোয়ারের পায়ের শব্দ।

''যদি ঠিক রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশ থেকে একটা পনেরোর মধ্যে,'' বলল মায়া, ''চট্টলা দুর্গ আক্রমণ করে ওদের ড্রোন সেন্টার উড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে একসঙ্গে সবকটা পাখি মারা পড়বে। আক্রমণ করাটা সমস্যা নয়। বিস্ফোরক,অস্ত্রশস্ত্র — সবই আমাদের কাছে যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, দুর্গের কোনো নকশা আমাদের কাছে নেই। চট্টলা দুর্গ একটা সামরিক ঘাঁটি, ভেতরের লোক ছাড়া কারোর কাছে সে নকশা থাকবে না। দুর্গের ভেতরটা কেমন, তা না জেনে আক্রমণ করলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হবে।''

''দৈবক্রমে,'' বলল থুরা, ''তোমার সমস্যার সমাধান হয়তো আমার কাছে আছে।''

''তার মানে?'' অবাক হলো মায়া।

পকেট থেকে নিজের মানিব্যাগ বের করল থুরা। ব্যাগের খাপে একরাশ মায়ানমার, পূর্ব খোরাসান ও ভারতের টাকার মধ্যে থেকে প্লাস্টিকে মোড়া একটা নীল তেলতেলে কাগজ বেরিয়ে এল। সাবধানে প্লাস্টিক মুক্ত করে সেই নীল কাগজটা মানচিত্রের পাশেই খুলে রাখলো থুরা। ছবিটা একটা নীলনকশা। মায়া ভালো করে দেখলো, নকশার কোণায় দিনাঙ্ক লেখা আছে ১৯৭০-এর। সঙ্গে ইংরেজি ও উর্দুতে কিছু লেখা আছে। ইংরেজিটা পড়ল মায়া। চট্টলা দুর্গ, পূর্ব পাকিস্তান। সঙ্গে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ডিভিশন ইত্যাদি লেখা রয়েছে।

''আশাকরি একাত্তরের পর দুর্গের ভেতরে বড়ো কোনো রদবদল হয়নি,'' বলল থুরা।

''এই নকশা আপনি কোথায় পেলেন?'' অবাক মায়া প্রশ্ন করল।

''ক'বছর আগে আমার ঠাকুর্দার পারলৌকিক কাজের জন্য বাড়ি গিয়েছিলাম। সেই সময় ওঁর কাগজপত্রের মধ্যে একটা পুরোনো চামড়ার ফাইল পেয়েছিলাম, ব্রিটিশ আমলে যেরকম ফাইল সামরিক মহলে ব্যবহার হতো, সেরকম। ফাইলের ওপরে লেখা ছিল 'জেনারেল ডেথ'। সেই ফাইলের অনেকরকম কাগজপত্রের মধ্যে এই নকশাটা পেয়েছিলাম। আরও কয়েকটা নকশা ছিল, একটা ছিল যশোর ক্যান্টনমেন্টের নকশা। সে যাই হোক, ততদিনে আরাকান আর্মির মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে, চট্টলার জন্য আমাদের কী করা উচিত, আমরা কী করতে পারি। আমার তখন মনে হয়েছিল, এই নকশাটা হয়তো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তাই আরাকান আর্মি যখন আমাকে চট্টলা পাঠাবে ঠিক করল, আমি দুটো দিন ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এই নকশাটা সঙ্গে নিয়ে নিলাম।''

''আপনার ঠাকুর্দা এটা পেলেন কীভাবে?'' বললো মায়া।

''ঠিক জানি না। তবে আমার সন্দেহ হয়, ওই ফাইলটা আমার ঠাকুর্দার গুরু ওঁর কাছে রেখে গিয়েছিলেন।''

''গুরু? মানে, কোনো সন্ন্যাসী, কোনো আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ? তার কাছে এরকম একটা সামরিক দলিল আসবে কীভাবে?''

মানিব্যাগের খাপে একটা ছবি দেখা যাচ্ছিল। হলদে হয়ে ওঠা ল্যামিনেট করা একটা ফোটো। ফোটোতে ফ্রেমবন্দি দুই সৈনিক, পরনে পুরোনো দিনের সামরিক পোশাক। এরমধ্যে একটা মুখ খুব চেনা ঠেকলো মায়ার। সেই দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে থুরা বলল, ''আমার দেশে লোকে বংশানুক্রমিক পদবি ব্যবহার করে না। কিন্তু আমি করি। আমার পদবি 'সান' নয়, 'সান্যাল'। আমার ঠাকুর্দা এসেছিলেন এই পূর্ববঙ্গ থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বর্মার রণাঙ্গনে লড়েছিলেন উনি। কিন্তু ইংরেজরা জিতে গেল, আজাদ হিন্দ ফৌজকে আত্মসমর্পণ করতে হলো। আমার ঠাকুর্দা আনন্দ সান্যালের মতো আরও অনেক সৈনিককে তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস বলেছিলেন, বর্মার স্থানীয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিশে যেতে, লড়াই চালিয়ে যেতে। খাতায়-কলমে আনন্দ সান্যাল মারা গেল, নতুন পরিচয়ে বর্মী ছদ্মবেশে তিনি আবার লড়াই শুরু করলেন।

বোসের সঙ্গে ঠাকুর্দার যোগাযোগ ছিল। বাড়িতে তখন কেউ 'বোস' নামটা উচ্চারণ করত না, বলত 'জেনারেল ডেথ'। সেই জেনারেল ডেথকে আমি সশরীরে দেখলাম ১৯৭১ নাগাদ, বর্মার মান্দালয়ে। আমার বাবা তখন বর্মার সামরিক গুপ্তচর বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার, জেনারেল ডেথ তখন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। সে বছর ঠাকুর্দা আর বাবা তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। বাড়িতে একটা পূজা হয়েছিল তখন, বেশ মনে আছে। সেই সময় সেই অনামা সন্ন্যাসী পরিকল্পনা করছিলেন, কীভাবে চট্টলা আর যশোর দুর্গ দখল করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে এগিয়ে আনা যায়। ওঁরা তিনজন মিলে কী পরিকল্পনা করেছিলেন, আমার তা জানা নেই। আমি তখন খুব ছোটো, কিন্তু আমাদের বাড়িতে এরকম অনেক গোপন মিটিং হতো, তার মধ্যে থেকে কিছু কথা আমার কানে আসতো। পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হলো। আমার ধারণা, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় নিশ্চয়ই ওঁদের কোনো ভূমিকা ছিল। সে যাই হোক, এখন আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হলো, দুর্গের ভেতরে ক'জন প্রহরী আছে, তারা কোথায় কোথায় থাকে, রাতে কতজন ডিউটিতে থাকে, এই সব খবর জোগাড় করা।''

''আমার এক বন্ধু আছে,'' বলল মায়া, ''আরিফ আমার ছোটোবেলার বন্ধু, আমরা এক স্কুলে পড়েছি। ও এখানকার সামরিক বিভাগে কাজ করে। এক্স-মুসলিম সংগঠনে আছে, তাই ওর কাছ থেকে এসব খবর হয়তো পাওয়া যেতে পারে। আমি চেষ্টা করছি।''

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো মায়া। এদিক-ওদিক তাকালো।

''কী হলো?'' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল থুরা।

''একটা গন্ধ পাচ্ছ কি?'' বলল মায়া।

''কী গন্ধ?''

''নারকেল তেলের গন্ধ,'' বলল মায়া, ''মা চুল বাঁধার সময় ঠিক এইরকম নারকেল তেলের গন্ধ পেতাম। মা-কে আর আজকাল আমার মনে পড়ে না, শুধু এই গন্ধটা বারবার পাই।''



এই অঞ্চলে রাত্রি খুব দ্রুত নেমে আসে। এই মুহূর্তে জঙ্গল আলো হয়ে আছে, যেন এক অগ্নিগর্ভ মরকত-মণি। যেন মা তারার সবুজ রূপ, জীবনের প্রতীক। পরমুহূর্তেই তা দ্রুত পরিবর্তিত হলো মা তারার কালো রূপে, যে রূপে তিনি সর্বব্যাপী মৃত্যুরূপী কাল, জীবন-হন্তা। অন্ধকারে মিশে ওরা অগ্রসর হলো দুর্গের দিকে। একটু আগেই মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, এখনো তার ঝিরিঝিরি অবশেষ নিরন্তর চলছে। বাতাসের চিটচিটে আর্দ্রতা চামড়ায় জ্বালা ধরায়। কাদায় প্যাচপ্যাচে মাটি, ভারী বুটের শব্দ তাতে ঢাকা পড়ে যায়। ধোঁয়াশায় ঢেকে আছে চারিদিক। দূরে কোথাও লাউডস্পিকার থেকে আস্ফালন ভেসে আসছে— ''পবিত্রতাই ইসলাম। কাফের সাফ করো।''

বৃষ্টির কালো চাদরে ঢাকা পড়েছে পাহাড় আর সমতলের মিলনস্থল। ঘন অরণ্যের ভেতর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া যখন দুর্গের পাথুরে দেওয়ালে আছড়ে পড়ছে, তখন মনে হচ্ছে আদিম কোনো দানব অন্ধকারে গর্জন করছে। আকাশের বুক চিরে যখন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, তখন সেই ক্ষণিক আলোয় দুর্গের জরাজীর্ণ কঙ্কাল এক মুহূর্তের জন্য চরাচরে ভেসে ওঠে— বিবর্ণ প্রাচীর, ভেঙে পড়া চূড়া আর শিকড়বাকড়ে জড়ানো লাল পাথর। যেন কোনো

এক অভিশপ্ত প্রাসাদ। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই লাল দেওয়ালগুলো। গণেশ ঘোষ আর লোকনাথ বলের ছোঁড়া গুলির আঘাত এখনও গর্বভরে বুকে ধারণ করে আছে এই ইঁট-কাঠ-পাথর। মাস্টারদাকে এখনো ভোলেনি ওরা। পাকিস্তানি আমলে মুক্তিবাহিনীর লোকেদের এখানে ধরে নিয়ে আসা হতো যন্ত্রণা দিয়ে কথা বার করার জন্য। মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের দাগ এখনো লেগে আছে দেওয়ালের গায়ে। সেসব স্মৃতিও ভোলেনি এই দেওয়ালগুলো।

দুর্গের ছাদহীন কক্ষগুলোতে অবিরাম ধারায় বৃষ্টির জল পড়েছে। পাথুরে মেঝেতে জমে থাকা জল যখন উপচে পড়ে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নীচে গড়িয়ে যায়, তখন সেই শব্দের প্রতিধ্বনি দুর্গের অন্ধকার অলিন্দে এক ভূতুড়ে সুর তৈরি করে। সমুদ্র আজ অত্যন্ত উত্তাল, উত্তাল কর্ণফুলী, তাদের মিলিত গর্জন এতদূরেও শোনা যায়। লোনা বাতাস থেকে থেকে সজোরে আঘাত করছে, বৃষ্টির আর্দ্রতার সঙ্গে মিশে দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। একদিকে জঙ্গলের বাঁশঝাড়ের একটানা ঘর্ষণ, অন্যদিকে নদী আর সমুদ্রের গম্ভীর হুঙ্কার, এই দুয়ের মাঝে দুর্গটি আজ বড়ো অসহায়। বৃষ্টির ঝাপটায় দেওয়াল বেয়ে নেমে আসা জলধারাগুলো দেখতে অনেকটা কান্নার দাগের মতো লাগছে। প্রাচীরের ফাটলে বাসা বাঁধা বুনো গাছগুলো বাতাসের তোড়ে উন্মত্তের মতো মাথা কুটছে দুর্গের গায়ে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকালে দেখা যায়, দুর্গের খিলানগুলো যেন কালো বিশাল চোখ নিয়ে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে। এই দুর্যোগপূর্ণ রাতে পাহাড়ের অরণ্য সাগরের উন্মাদনা আর নদীর ক্রোধের মাঝে আটক পড়ে গেছে। অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গটি যেন মহাকালের একাকী এক রহস্যময় ধ্বংসস্তূপ, বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটায় নিজের হারিয়ে যাওয়া অহংকারকে হাহাকার করে খুঁজে ফিরছে।

পাঁচিলের ফাটলে গজানো অশ্বত্থগাছ থেকে প্রেতের মতো ঝুপ করে নামল একটা কালো ছায়া— মায়া। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। ০০৪৩, মানে রাত বারোটা তেতাল্লিশ। ঠিক সময়। গলার কাছের ট্রান্সমিটারে দুবার টোকা দিল। ''টিম বজ্র!''

এক-এক করে বাকিদের উত্তর ভেসে এল মায়ার কানের মধ্যে লুকোনো ইয়ারফোনে। নীলা, বোধিচিত্ত, মৈত্রী, অমিতাভ, থুরা। ''ওঁম তারে তুত্তারে তুরে— বজ্রজ্বল ফট্ ফট্— রক্ষ রক্ষ স্বাহা!'' ছ'টি স্বর বেতারতরঙ্গে ফিসফিস করে উচ্চারণ করল হাজার বছরের পুরোনো এক মন্ত্র, যার উৎস এই পূর্ববঙ্গেরই সুপ্রাচীন বজ্রযোগিনী গ্রামে।

ছয় বিদ্রোহী, যেন ছ'টি প্রেত। ছ'টি নির্দিষ্ট দায়িত্ব।

নীলাঙ্ক ইলেক্ট্রনিক্স

বোধিচিত্তঙ্ক অনুপ্রবেশ ও বিস্ফোরক

মৈত্রীঙ্ক নজরদারি ও স্নাইপার

অমিতাভঙ্ক কাজ শেষে সবাইকে নিরাপদে বের করে আনা

মায়াঙ্ক নেতৃত্ব

থুরাঙ্ক নির্দেশক

আজ যা যা করতে হবে, থুরা ওদেরকে তার মহড়া দিয়েছে কমপক্ষে পঁচিশ বার। তবু আজ মায়ার বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। ''০০৪৫,'' বলল মায়া, ''সবাই ঘড়ি মিলিয়ে নাও।''

নাইট ভিশন দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখল মায়া। পাহাড়ের প্রান্তে দুর্গটা যেন এক অতিকায় কালচে লাল প্রেত। লোহার পাতে মোড়ানো ভারী কাঠের দুটো দরজা, ভারী দুটো পাথরের থাম অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছে। থাম দুটোর ওপর ভাঙাচোরা দুটো সিংহের মূর্তি। এককালে তারা সগর্বে দুর্গকে রক্ষা করত, আজ তারা শুধুই অতীত গৌরবের সাক্ষী। দুর্গের দেওয়াল জুড়ে গুল্মলতার জঙ্গল। প্রাচীন সেই দেওয়ালের পেছন থেকে বিষাক্ত কাঁটার মতো উঁকি দিচ্ছে একাধিক বড়ো ছোটো স্টিলের অ্যান্টেনা। বড়ো একটা স্যাটেলাইট ডিস্ক নিঃশব্দে ঘুরে চলেছে। ওই ডিস্কের নীচেই আছে সার্ভার রুম। যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কম্পিউটার সফট্ ওয়্যার ঠিক করছে —কে বিশ্বাসী আর কে অবিশ্বাসী, কার বাঁচার অধিকার আছে আর কে ওয়াজিব-উল-কতল। বাইরে থেকে এখনো দেখে মনে হয় এটা একটা প্রাচীন দুর্গ। কিন্তু প্রাচীন দেওয়ালের আড়ালে এটা একটা আধুনিক ড্রোন কমান্ড সেন্টার। হঠাৎ একটা কথা মনে হলো থুরার। প্রতিটা স্বৈরাচারীই বোধহয় উত্তরাধিকার সূত্রে পায় তার আগের স্বৈরাচারীর সাম্রাজ্য, তার ব্যবস্থা, এর সঙ্গে তার গুপ্তকথা, তার অভিশাপ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল থুরা।

দুর্গপ্রাকার থেকে প্রায় দুশো মিটার দূরে পাহাড়ের খাঁজে শরীরটাকে আড়াল করে শুয়ে ছিল মৈত্রী, হাতে অয়েলক্লথ জড়ানো দ্রাগুনভ স্নাইপার রাইফেল। রাইফেলের টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে পেল, দুর্গপ্রাকারের ওপর দিয়ে দুদিক থেকে দুজন প্রহরী কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসছে। জলে ভেজা পাথরের গায়ে তাদের ভারী জুতোর আওয়াজ উঠছে— থপ থপ, ছপ ছপ— থপ থপ, ছপ ছপ। দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল মৈত্রী। দুজন প্রহরীর মাথা যখন ওর রাইফেলের সঙ্গে এক সমান্তরাল রেখায় এল, ঠিক তখনি রাইফেলের ঘোড়া দাবালো মৈত্রী। রাইফেলের সাইলেন্সার থেকে ব্লপ্ করে মিহি একটা শব্দ নির্গত হলো, তার সঙ্গেই ধুপ্ করে আওয়াজের সঙ্গে একইসঙ্গে দুজন প্রহরী প্রাকার থেকে মাটিতে এসে পড়ল। পরমুহূর্তেই ওর গ্র্যাপলিং বন্দুক ফায়ার করল বোধিচিত্ত। বন্দুকের মুখ থেকে নির্গত হয়ে নোঙ্গর সোজা উড়ে গেল দুর্গপ্রাকারের দিকে, আটকে গেল সিংহের মূর্তিতে। দড়িতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেখল বোধিচিত্ত, সেটা খুব দৃঢ়ভাবে নোঙ্গরে আটকে আছে। নীলা প্রথম গেল। দড়ি ধরে একটা লাফ দিল, ওর পা যেন নাচের ভঙ্গিতে অনায়াসে পাঁচিলের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। মৈত্রী অনুসরণ করল, জীর্ণ দেওয়ালের ভাঙা ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে পা রেখে সাবধানে পৌঁছে গেল প্রাকারের ওপরে। এরপরে মায়া। বৃষ্টিতে পিছল হয়ে আছে দুর্গের দেওয়াল। এমনকী দড়িটাও।

চামড়ায় ঘষা লেগে জ্বালা করে উঠল। মায়া যখন প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছেছে, হঠাৎ একটা সার্চলাইট ওর ওপর এসে পড়ল।

''হল্ট!''

ব্লপ্ করে একটা বোবা শব্দ হলো। মৈত্রীর গুলিতে স্তব্ধ হলো আরেকজন প্রহরী। পরের গুলিটা চুরমার করে দিল সার্চলাইটের তীব্র দৃষ্টি। শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে মায়া পৌঁছে গেল পাঁচিলের ওপারে। সেখান থেকে ভেতরটা দিব্বি দেখা যায়। দুর্গের ঠিক মধ্যিখানে একটা সমতল জমি। আগে নিশ্চয়ই এখানে প্রহরীদের কুচকাওয়াজ হতো। এখন সেই জায়গায় একধারে রয়েছে স্টিলের বিশাল এক খাঁচা, পুরো জায়গাটাই কাঁচের দেওয়ালে ঢাকা। ড্রোন হ্যাঙ্গার। শয়ে শয়ে ড্রোন সেখানে চার্জ হচ্ছে। সূক্ষ্ম লাল নীল আলোতে ভূতুড়ে হয়ে আছে জায়গাটা। একদল লোক ব্যস্ত আছে সেই ড্রোনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে, ডজনখানেক প্রহরী পাহারা দিচ্ছে তাদের। বাতাসে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে পাথরের গন্ধ, ইলেক্ট্রনিক সার্কিটের উষ্ণ গন্ধ। নাক সিঁটকালো মায়া।

''০০৫৬,'' বেতারতরঙ্গে বলল অমিতাভ।

দৃশ্যটা দেখে খটকা লাগলো মায়ার। আগে কখনো ড্রোন কমান্ড সেন্টার দেখেনি ও। কিন্তু মন বলছে, এটা যেন শুধু ড্রোন সেন্টার নয়। তারচেয়েও বড়ো কিছু। কাঁচের দেওয়ালে ঢাকা জায়গাটার অন্যপাশে ছড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো কিছু বৃত্তাকার কংক্রিটের ঢাকনা। থিরথির করে কাঁপছে মাটি, মৃদু গুঞ্জনের শব্দ ভেসে আসছে মাটির গভীর থেকে। মায়ার সতর্ক কান ইঙ্গিত দিল, যেন মাটির নীচে অনেক লোক কথাবার্তা বলছে। পুরো জায়গাটায় এক ধরনের অস্বস্তিকর থমথমে ভাব বিরাজ করছে। কী ব্যাপার?

সমতল জমিটার জায়গায় জায়গায় কামান রাখা আছে। কে জানে কত শতাব্দী তাদের থেকে আগুনবৃষ্টি হয়নি। মোটা তারের গোছা জড়িয়ে রাখা আছে তাদের গায়ে। নিঃশব্দে সেরকম একটা তারের গোছার জংশন বক্স খুলে ফেলল নীলা, পকেট থেকে বিস্কুটের মতো পাতলা একটা ইলেক্ট্রনিক বোর্ড বের করে তারমধ্যে ঢুকিয়ে দিল। মণিবন্ধ সংলগ্ন মনিটরে ভেসে উঠল একগুচ্ছ সংখ্যা আর হরফ—অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ কোড। নাকের ডগার চশমাটাকে ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে লেগে পড়ল সিকিউরিটি সিস্টেমের ফায়ারওয়াল কোড অধ্যয়নে। চশমার কাঁচে প্রতিফলিত সংখ্যাগুলো দ্রুত বদলাতে লাগলো। দাঁত কিড়মিড় করে ফায়ারওয়াল কোডের উদ্দেশ্যে কয়েকটা গালাগাল দিল নীলা। বলল মনে মনে, ভেবেছিস কী? তোদের ভাষা কেউ বোঝে না? ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় নীলার জেদের কাছে আত্মসমর্পণ করল ফায়ারওয়াল কোড। নিঃশব্দে দুর্গের সবকটা দরজার লক খুলে গেল। অন্ধ হয়ে গেল সবকটা ক্যামেরা।

''ফুরেইয়ে,'' বলল নীলা।

''০১০৪,'' বেতার তরঙ্গে ফিসফিস করে উঠল অমিতাভর স্বর।

মায়া আর বোধিচিত্ত নীচু হয়ে এগিয়ে গেল ড্রোন হ্যাঙ্গারের দিকে। ঝড়ের পর জমে থাকা বৃষ্টির জল ওদের বুটের নীচে চাপা ছপছপ শব্দ তুলছে। চারপাশে আধো অন্ধকার ; শুধু দূরের সার্চলাইট মাঝে মাঝে ঘুরে এসে কাঁচের দেওয়ালে সাদা আলো ফেলে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঙ্গারের কাঁচের দরজাটায় এক ইঞ্চি ফাঁক। ভেতর থেকে নীলাভ আলো বেরিয়ে আসছে। দরজার সামনে তিনজন প্রহরী দাঁড়িয়ে। AK-47 কাঁধে ঝুলছে, চোখে ক্লান্তি। ওরা জানেই না, মৃত্যু ওদের কয়েক সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

মায়া কোমরবন্ধ থেকে একটা আধুলি-সাইজের ধাতব বস্তু বের করল। ছোট্ট একটু চাপ দিয়ে তারপর আঙুলের ফাঁকে ঘুরিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিল ওদের দিকে।

ঠক।

জিনিসটা গড়িয়ে গিয়ে থামল প্রহরীদের বুটের কাছে।

একজন ভ্রূ কুঁচকে নীচু হলো।

''এটা আবার—''

ফ্ল্যাশ!

চোখ ধাঁধানো সাদা আলো পুরো করিডোর গ্রাস করল। সঙ্গে বিকট শব্দে কেঁপে উঠল কাঁচের দেওয়াল।

প্রহরীরা চিৎকার করে উঠল। দু'হাতে চোখ চেপে ধরে এলোপাথাড়ি পা ফেলতে গিয়ে হোঁচট খেল।

ঠিক তখনই—

ঠাস!

দূর থেকে মৈত্রীর স্নাইপার রাইফেলের গুলি এসে প্রথম প্রহরীর কপাল ভেদ করল। লোকটার মাথা ঝাঁকুনি খেয়ে পেছনে ঘুরে গেল, শরীরটা যেন সুতোকাটা পুতুলনাচের পুতুলের মতো ধপ্ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

বাকি দু'জন কিছু বুঝে ওঠার আগেই মায়া ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রথম লোকটার বুকের ওপর হাঁটুর আঘাত হেনে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিল। একই সঙ্গে অন্যজনের গলা দু'হাতে চেপে ধরল। লোকটা রাইফেল তুলতে যাচ্ছিল, মায়া তার কবজিতে মোচড় দিল।

মট্! হাড় ভাঙার শব্দ।

লোকটা আর্তনাদ করতেই মায়া তার মুখে কনুইয়ের গুঁতো মারল। দাঁত ভেঙে রক্ত ছিটকে পড়ল কাঁচের দরজায়। অন্য প্রহরীটা কোমর থেকে পিস্তল বের করার চেষ্টা করছিল। মায়া মাটিতে পড়ে থাকা রাইফেলটা লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার ঘাড়ের পাশে রদ্দা মারল।

ধপ!

লোকটা টাল খেয়ে পড়তেই মায়া তার মাথা ধরে সজোরে কাঁচের দেওয়ালে ঠুকে দিল। কাঁচ ফেটে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে গেল। একদলা রক্ত আর ঘিলু ধেবড়ে লেগে রইল তার

সঙ্গে।

এই ফাঁকে বোধিচিত্ত দরজার ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

''০১০৬,'' ইয়ারপিসে ভেসে এল অমিতাভর শান্ত গলা।

পরের মুহূর্তেই —

ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়াওঁ—

তারস্বরে অ্যালার্ম বেজে উঠল। লাল জরুরি আলো জ্বলে উঠতেই পুরো হ্যাঙ্গারটা রক্তবর্ণ হয়ে গেল। সারি সারি ড্রোনের কালো শরীরগুলো দেখতে লাগল রাগি ঘুমন্ত দানবের মতো।

দূরের করিডোর দিয়ে দৌড়ে আসছে বাকি প্রহরীরা। ভারী বুটের শব্দ ধাতব মেঝেতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে।

অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা থুরা প্রথম গুলি চালাল।

টাট! টাট!

দুই প্রহরী বুক চেপে পড়ে গেল।

নীলা পাশের স্তম্ভের আড়াল থেকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল চালাল। গুলির আঘাতে কাঁচ চূর্ণ হয়ে চারদিকে উড়ে গেল। অমিতাভ খুব হিসেব করে শট নিচ্ছে — প্রতিটা গুলি হাঁটু, গলা বা কাঁধে। যেন লোকগুলোকে থামিয়ে রাখা তার উদ্দেশ্য, হত্যা নয়।

বোধিচিত্ত ইতিমধ্যে হ্যাঙ্গারের ভেতরদিকে দৌড়েছে। ওর হাতে ছোটো ছোটো প্লাস্টিক বিস্ফোরক। একটার পর একটা বসিয়ে যাচ্ছে —ড্রোনের তাকগুলোর নীচে, জেনারেটরের পেছনে, ফুয়েল লাইনের জংশনে।

ক্লিক। ক্লিক। ক্লিক। চুম্বক আটকে যাচ্ছে ধাতুর গায়ে।

বোধিচিত্তর শ্বাস ভারী হয়ে উঠেছে। ঘামে ভিজে গেছে কপাল। কিন্তু হাত কাঁপছে না।

ঠিক তখনই — ক্লিক খঠাস্! মায়ার কান ঘেঁষে একটা গুলি উড়ে গেল।

মায়া পাশের সার্ভিস ডেস্কটা উলটে আড়াল নিল।

ঠাস্! আরেকটা গুলি ডেস্ক ভেদ করে চলে গেল, কাঠের টুকরো উড়ে গেল ওর মুখের পাশ দিয়ে। ও বুঝল, টেকনিশিয়ানদের কারোর কাছে অস্ত্র আছে।

লাল আলোয় দেখতে পেল, সাদা কোট পরা একজন লোক কন্ট্রোল কনসোলের আড়ালে বসে পিস্তল তাক করে আছে।

লোকটা আবার গুলি চালাল।

মায়া গড়িয়ে পাশ বদলালো। পরের গুলিটা কানের পাশ ঘেঁষে চলে গেল। কয়েকটা চুল বাতাসে উড়ল।

মায়া নিঃশ্বাস চেপে অপেক্ষা করল।

এক সেকেন্ড।

দুই সেকেন্ড।

লোকটা মাথা তুলতেই ও টেবিলের ওপর ভর দিয়ে নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দিল সামনে। মাঝ-আকাশে থেকেই ট্রিগার টিপল।

ধাম!

লোকটার কাঁধ ফেটে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরোলো। পিস্তল হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে।

সময় শেষ হয়ে আসছে। ''০১১০,'' অমিতাভর গলা ভেসে এল ইয়ারপিসে, এবার আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ, ''আর দু'মিনিটের মধ্যে বেরোতে হবে!''

ঠিক তখনই শোনা গেল ভারী বুটের শব্দ।

ধুপ। ধুপ। ধুপ।

এটা সাধারণ প্রহরীদের হাঁটা নয়। তাল মিলিয়ে এগিয়ে আসছে পুরো একটা স্কোয়াড।

রিজার্ভ সেনারা জেগে উঠেছে।

দূরের করিডোরে কালো ছায়াগুলো দেখা দিল। ভারী বডি-আর্মার, হেলমেট, নাইট-ভিশন গগলস। একজন হাঁটু গেড়ে বসে মেশিনগান সেট করল।

পরের মুহূর্তেই আগুনের ঝড় শুরু হলো।

ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট!... ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট!

গুলির চাপে কাঁচের দেওয়াল বিস্ফোরিত হয়ে উড়ে গেল। ড্রোনের সারিগুলো ভেঙে পড়তে লাগল। ধাতব টুকরো বাতাসে ছিটকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

মায়া একটা উলটে যাওয়া ট্রলির আড়ালে আশ্রয় নিল। গরম সিসার ঝাঁক মাথার ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে উড়ে যাচ্ছে। পাশেই একজন আহত প্রহরী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

বোধিচিত্ত শেষ বিস্ফোরকটা জেনারেটরের নীচে বসিয়ে চিৎকার করল—

''সবাই বের হও! ভাগ-অ ...!''

ঠিক তখনই একটা গুলি এসে ওর বাহু ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। একদলা রক্ত ছিটকে পড়ল ধাতব মেঝেতে।

মায়া মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে গিয়ে বোধিচিত্তকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল থামের আড়ালে। একই সঙ্গে পড়ে থাকা রাইফেল তুলে পুরো ম্যাগাজিন খালি করে দিল করিডোরের দিকে।

''তৈরি?'' গুলি ছোঁড়ার ফাঁকেই বলল মায়া।

''তৈরি,'' বলল অমিতাভ। ইতিমধ্যেই অমিতাভ জিপলাইন টাঙিয়ে ফেলেছে, লম্বা একটা স্টিলের দড়ি দুর্গ থেকে সোজা চলে গেছে বাইরে, সোজা জঙ্গলের মধ্যে।

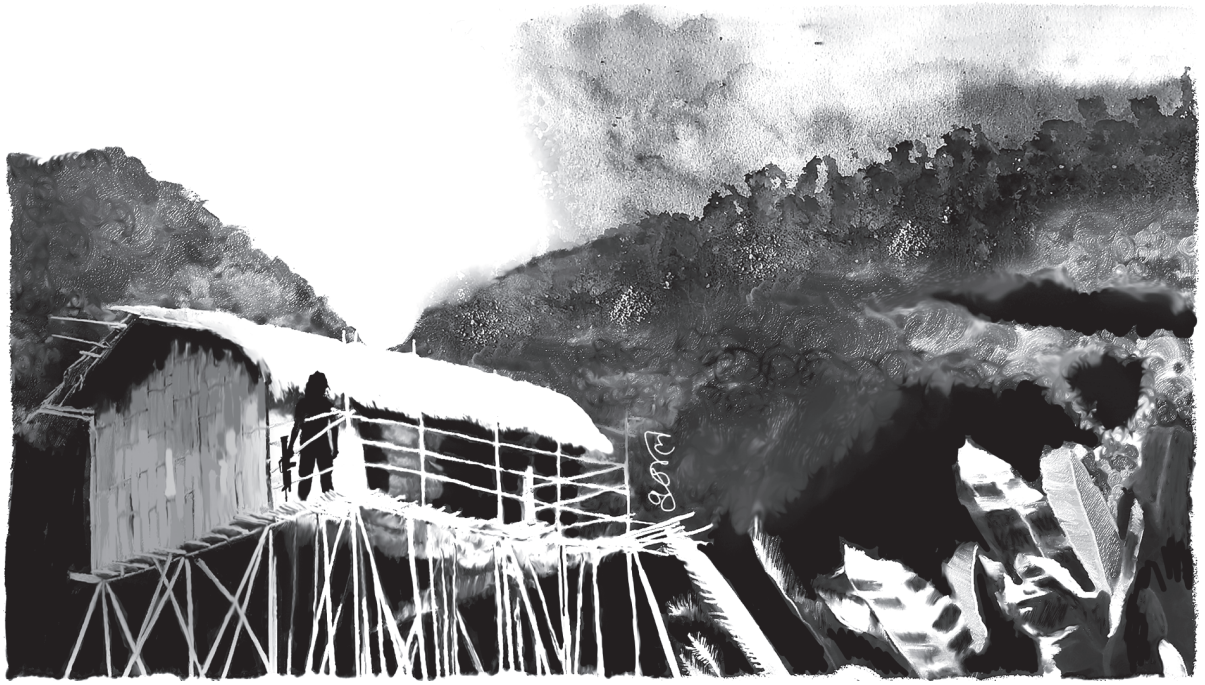
''নীলা,'' বলল মায়া।

''হাক্কন তাক,'' বলল নীলা, ''একটা বিদায় মেসেজ দিয়ে যাই!''

কীবোর্ডে শেষ কী ঠুকে জিপলাইনের দিকে দৌড়ল নীলা। ট্রলি ধরে ঝুলে পড়ল। নিমেষে স-র-র-র-র-র-র-র-র-র শব্দের সঙ্গে ট্রলি ওকে পৌঁছে দিল জঙ্গলের আড়ালে। ট্রলি ফিরে আসতেই লাফিয়ে ঝুলে পড়ল বোধিচিত্ত।

''মায়া, তুমি কোথায়?'' বলল অমিতাভ।

''তোমরা এগোও, আমি কভার ফায়ার দিচ্ছি, পেছন পেছন আসছি,'' বেতারে ভেসে এল মায়ার গলা।



ঠিক এই সময় একটা গুলি এসে লাগলো মায়ার পায়ে। হোঁচট খেয়ে পড়ল মায়া। পর মুহূর্তেই আরও দুটো গুলি এসে লাগলো ওর কাঁধে। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল মায়া।

''মায়া!'' চিৎকার করে উঠল অমিতাভ।

''অমিতাভ,'' যন্ত্রণাক্লিষ্ট কিন্তু স্থির স্বরে নির্দেশ দিল মায়া, ''পালাও তোমরা। পরিকল্পনা মতো কাজ চালিয়ে যাও। এটাই আমার শেষ নির্দেশ।''

মৈত্রী লাফিয়ে উঠল ট্রলিতে।

''থুরা, এবার আপনি,'' বলল অমিতাভ।

''তুমি যাও,'' বলল থুরা, ''আমি মায়াকে নিয়েই ফিরবো।

''কিন্তু মায়ার নির্দেশ '' প্রতিবাদ করল অমিতাভ।

''মায়ার নির্দেশ তোমাদের ওপর প্রযোজ্য,'' বলল থুরা, ''আমার ওপর নয়।'' এই বলে অন্ধকারে যেখানে মায়ার অবয়বটা মাটিতে পড়ে আছে, সেদিকে দৌড়োল থুরা।

ঠিক সেই সময় একসঙ্গে সব বিস্ফোরক সক্রিয় হলো।

তুমুল শব্দে ফেটে পড়ল ড্রোন হ্যাঙ্গার। ভেঙে পড়ল অ্যান্টেনাগুলো, উত্তাপে গলে গেল সার্ভারের কাঠামো। দুর্গের প্রাচীন কাঠামো রইল অবিকৃত, কিন্তু মুহূর্তে তার মধ্যেকার আধুনিক হৃদয় গলে প্ল্যাস্টিক আর ফাইবারের নিথর দলায় পরিণত হলো।

জিপলাইনের ট্রলি বেয়ে ওপারে পৌঁছে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে নামলো অমিতাভ। ঠিক তখনি দেখল, জিপলাইনের অন্য প্রান্তে আগুন ধরে গেছে।

আচমকা আকাশে শোঁওওও করে একটা শব্দ হলো, মনে হলো যেন উল্কাপাত হলো। তার পরেই আরেক দফা বিস্ফোরণের দমকে কেঁপে উঠল মাটি। এবারের বিস্ফোরণ আগেরবারের থেকে অনেক গুণ বেশি। আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গীরণের মতো হাজারো ধাতুপিণ্ড মাটির গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হলো আকাশের দিকে। আগুন ছড়িয়ে পড়ল গোটা দুর্গ জুড়ে।

দৌড় দৌড় দৌড়। ওরা যখন থামল, দুর্গের আগুন তখন একটা জোনাকির মতো দেখাচ্ছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, বিশাল একটা ছায়ামূর্তি ওদের দিকেই দৌড়ে আসছে। দূরবীনে চোখ লাগিয়েও বুঝতে পারল না অমিতাভ, কে ওটা। সবাই নিজের নিজের আগ্নেয়াস্ত্র বাগিয়ে ধরল।

ঝড়ের গতিতে অবয়বটা এসে পড়ল। দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ এক নারীমূর্তি, শ্যামলা বরণ। পরনে কালো মিলিটারি প্যান্ট, অনেকগুলো পকেট তাতে। কোমরবন্ধের বাঁ-দিকে ঝুলছে খাঁজকাটা দীর্ঘ কমান্ডো ছুরি, ডানদিকে খাপের মধ্যে সাইলেন্সার যুক্ত গ্লক বন্দুক। উর্ধাঙ্গে কালো গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বলিষ্ঠ শরীর। ডুমো ডুমো মাংসপেশী খেলা করছে সারা শরীরে। গলায় দু'ছড়া রুদ্রাক্ষের মালার সঙ্গে একছড়া মুণ্ডমালা, কাপালিকরা যেমন ধারণ করে। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না। কাঁধ থেকে মায়াকে মাটিতে নামিয়ে রাখলো সেই নারী। অবাক হলো সবাই। এই এত ভারী মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে এতটা পথ দৌড়ে এল এই মহিলা, কিন্তু একটুও হাঁপাচ্ছে না!

চিৎ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল মায়া। চোখের পাতা আঠালো, খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। বহু বছর বাদে এই প্রথম দেখল, আকাশের ঘন মেঘের ক্যানভাসে ড্রোনের লাল-নীল আলোগুলো আর নেই।

''থুরা কোথায়, থুরা?'' জড়ানো স্বরে বলল মায়া। তারপরেই, ঝাপসা হয়ে এল ওর চোখজোড়া। ঠিক এই সময়, চট্টলার সবার মোবাইলে একসঙ্গে একটা মেসেজ পৌঁছল ; বাংলা, চট্টলা ও আরাকান ভাষায়।

আজ থেকে আমাদের আকাশ স্বাধীন হলো!

আইজ্জা তত্তুন আঁরার আকাশ স্বাধীন ওইল্ল!

ইয়েনেই ম্ন্যা সা ইয়ে, ঙাতো রি মো কৌন গিন দেঁ লুত লপ থোয়া বি!

ওঁম তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা!



জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে ছিল বোধিচিত্ত। কুয়াশার পাতলা চাদর সরিয়ে জুম চাষের ঢালু জমি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সর্পিল পাহাড়ের গায়ে সবুজের বিভিন্ন মাত্রা। কোথাও গাঢ় নীলচে সবুজ, কোথাও বা কচি ধানের সতেজ আভা। এইমাত্র পুব আকাশের সিঁদুরে আভা পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছড়িয়ে পড়ল, ঠিক তখনই চোখে পড়ল অনেক নীচে একলা একটা কুঁড়েঘর। জুম ক্ষেতের ঠিক মাঝখানে উঁচু মাচাঙের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশ আর ছনের তৈরি ছোট্ট ঘরটা যেন অনেক জন্মের চেনা। ঘরটা থেকে শেষ রাতের হালকা ধোঁয়া বেরিয়ে একটু একটু করে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে গিয়ে মিশছে। চারপাশে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক কমে এসে নাম-না-জানা পাহাড়ি পাখিদের কলকাকলি শুরু হয়েছে। ফসলের ওপর ভোরের শিশিরবিন্দু সূর্যের প্রথম স্পর্শে মুক্তোর মতো চিকচিক করে উঠছে। ঘন বাঁশঝাড় আর জংলি লতাগুল্মর নিবিড় জঙ্গল ভেদ করে কুয়াশার পাতলা চাদর ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। বুনো লতাপাতা আর শ্যাওলার আর্দ্র গন্ধ মেশা বাতাসে এক অপার্থিব সতেজতা।

ওই কুঁড়েঘরটা .... ঠিক যেন আমার ফেলে আসা ঘরটার মতো। যেখানে এই জন্মে আর ফেরা হবে না। বিশেষ করে গত রাতের সাফল্যের পর জেহাদিরা ওকে নিশ্চয়ই হন্যে হয়ে খুঁজছে। চোখের জল মুছলো বোধিচিত্ত। অথচ ক'বছর আগেও ওই বাড়িটাই তো ছিল বোধিচিত্তর পৃথিবী। বিশেষ করে একটা ভোরের কথা আজ বারবার মনে পড়ছে।

''বোধিচিত্ত কথাটার মানে জানিস তো?'' সেদিন বলেছিল অমিতাভ, ''বোধিচিত্ত হলো জাগরিত চিত্ত, সুপার কনশাসনেস। সাধারণ মানুষ যা দেখে থেমে যায়, বোধিচিত্ত সেখান থেকেই পথ চলা শুরু করে। তোর ভেতরের এই বোধিচিত্ত শক্তিকে চিনতে শেখ, দেখবি জগতের কোনো ঘটনাই তোকে আর দমিয়ে রাখতে পারছে না।"

এই ভোরটার মতোই সেদিনও রাঙামাটির গহীন অরণ্যে ভোরের কুয়াশা বাঁশঝাড়ের মাথায় মুক্তোর মতো জমে ছিল। প্রতিদিনের মতোই সেদিনও কুড়ি বছরের তরুণ বোধিচিত্ত ভোরবেলায় জেগে উঠেছিল। ওর গ্রামটা মায়ানমার সীমান্তের ঠিক কোল ঘেঁষে, যেখানে উঁচু পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে মেঘেরা লুকোচুরি খেলে।

বোধিচিত্তর দিনটা শুরু হয়েছিল একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে। সকালের কড়া চায়ে চুমুক দিয়ে ও জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। একসময় এই পাহাড়ে শুধু চাকমাদের জুম চাষের গান আর বাঁশির সুর শোনা যেত, কিন্তু এখন দূর থেকে ভেসে আসে অচেনা কোলাহল। দিনে পাঁচবার প্রার্থনার ডাক। ভিনদেশী ভাষায়, অচেনা সুরে। যে ডেকে বলে, তোমার বুদ্ধ হলো বুৎপরস্তি, পাপ। তোমার বিশ্বাস সব মিথ্যে, সত্যি শুধু সাগরপারের আমদানি করা এক অন্ধ বিশ্বাস।

ওর ডায়েরির পাতায় কলম চলেছিল ঃ 'আমার জুমের ক্ষেতে আজ হার্মাদের ছায়া, কাঁটাতারে বিঁধে আছে পূর্বজদের মায়া।'

এই লাইনগুলো তো কেবল কবিতা ছিল না, ছিল ওর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। ও জানত, এই পরিবর্তন আকস্মিক নয়, বরং কয়েক দশকের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত মুসলমান বসতি স্থাপন কর্মসূচির ফল, যা পার্বত্য চট্টলার জনবিন্যাসকে আমূল বদলে দিয়েছে। একসময় যেখানে জনজাতিরা ছিল মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশেরও বেশি, এখন সেখানে মুসলমান ও বৌদ্ধ জনসংখ্যা প্রায় সমান। ও অনুভব করছিল, ওর চেনা মানচিত্রটা যেন প্রতিদিন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। নতুন বসতি স্থাপনকারীদের আগমনে ভূমিবিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। অনেক জনজাতি

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

পরিবার তাদের পৈতৃক জমি হারিয়েছে। সমতল থেকে আগত লোকেরা অনেকেই আগ্রাসী, কট্টর । ওদের পেছনে আছে মিলিটারির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত।

চাকমা সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী উৎসবের দিনগুলোতেও এখন এক ধরনের অজানা আতঙ্ক বিরাজ করে। জামাতের লোকেরা এসে উৎসবের মধ্যে হামলা করে, গণ্ডগোল পাকায়। ওদের পেছন পেছন আসে মিলিটারি। চাকমা যুবকদের ধরে নিয়ে যায়। তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। বোধিচিত্ত ভাবে, জনতাত্ত্বিক এই পরিবর্তন কি একদিন চাকমাদের নিজস্ব ভাষাকে মুছে দেবে? পাহাড়ে কাজ নেই। অনেক চাকমা তরুণ-তরুণী শিক্ষার খোঁজে বা উন্নত জীবনের আশায় শহরমুখী হচ্ছে। তারপর ছলে বলে কৌশলে তাদেরকে ধর্মান্তর করা হচ্ছে। চাকমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা সর্বত্র হারিয়ে যেতে বসেছে।

দুপুরের কড়া রোদে দেখা হয়েছিল বাল্যবন্ধু অমিতাভর সঙ্গে। অমিতাভ কিছুদিন আগে শহর থেকে গ্রামে ফিরেছে, তবে ছুটির আনন্দে নয়। ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই চাকমা জন্মভূমির জনতাত্ত্বিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। ওদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে কোণঠাসা করার প্রতিবাদে ও ছিল সামনের সারিতে। ফলস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অমিতাভকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করেছে। সম্প্রতি ওকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যদি ও লিখিতভাবে ক্ষমা চায় এবং ভবিষ্যতে এসব আন্দোলন থেকে দূরে থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবেই ওকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু অমিতাভ মাথা নত করেনি। ও বোধিচিত্তর দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল, 'নিজের শেকড়ের সঙ্গে বেইমানি করে পাওয়া ডিগ্রি দিয়ে আমি কী করব রে বোধি? ওরা আমাদের মাতৃভূমি কেড়ে নিচ্ছে, এবার আমাদের কণ্ঠস্বরও কেড়ে নিতে চায়।'

বিকেলে দুই বন্ধু মিলে সীমান্তের লাগোয়া সেই পুরনো ঝরনার পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়েছিল। অমিতাভর চোখেমুখে বিদ্রোহের আগুন, আর বোধিচিত্তর বুকে কবিতার বেদনা। সন্ধ্যার আবছায়ায় মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মাঝে বসে ও লিখে ফেলেছিল ওর নতুন কবিতা—'চিত্ত'। ও লিখেছিল,

'ভয়ের চাদরে ঢাকা ছিল যে নীরব নিশ্চল,
চেতনার আগুনে পুড়ে সে পাহাড় আজ হলো চঞ্চল।
ভেঙেছে অমিতাভর আজন্মকালের ধ্যান,
পাহাড়ের বুক গাইল সে এক নতুন ভোরের গান।'

রাত বাড়ল, সীমান্তের ওপারে সেনাচৌকির আলো জ্বলে উঠল। পার্বত্য চট্টলায় সামরিক উপস্থিতি এখানকার মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে গা-সওয়া হয়ে উঠেছে প্রতিদিনের অপমান, লুটতরাজ, ধর্ষণ। বোধিচিত্ত ওর ডায়েরিটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরেছিল। ও জানত, অমিতাভর মতো বন্ধুরা আছে বলেই হয়তো আজও এই পাহাড়ের আকাশটা ওদের নিজস্ব রয়ে গেছে। আগামীর সূর্য হয়তো কঠিনতর পরীক্ষা নেবে, কিন্তু চাকমারা তো আপোশ করতে শেখেনি। যতক্ষণ ওর কলম আছে, ততক্ষণ ও পাহাড় আর মানুষের কথা বলে যাবে।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারেনি বোধিচিত্ত। অমিতাভর একটা কথা কাঁটার মতো খচখচ করছিল—''আন্দোলন করে আর কবিতা লিখে কোনো লাভ নেই রে বোধি! ওসব সভ্য সমাজে কাজে লাগে। এরা হলো বর্বর, অসভ্য। এরা একটাই ভাষা বোঝে, সেটা হলো অস্ত্রের ভাষা। মায়া চাকমার নাম শুনেছিস? বয়সে বোধহয় আমাদের থেকেও ছোটো, কিন্তু ওর আহ্বানে গোটা চাকমা সমাজ আজ এক হচ্ছে। আমি ভাবছি, ওর সঙ্গে দেখা করব।''

সেই দিনটা, আর আজকের দিনটা। ছিলাম কবি, হয়েছি যোদ্ধা। আমি আবার কবিতা লিখব। সেদিন, যেদিন সবাই এই মাটিতে মাথা উঁচিয়ে বাঁচতে পারবে।

''বোধিচিত্ত— বোধিচিত্ত!'' দূর থেকে মায়ার ডাকে সম্বিৎ ফিরল। তড়িঘড়ি করে পা চালালো।



''তোমরা কি পাগল?'' দীর্ঘদেহী সেই নারী ধমক দিল, ''পাঁচজন আনাড়ি মিলে দল বেঁধে বাঘের গুহায় ঢুকে তাণ্ডব করতে গিয়েছিলে!''

''পাঁচজন নয়, ছজন!'' দুর্বল স্বরে বলল মায়া, ''কিন্তু আপনি কে? ওখানে কী করছিলেন?''

সামনে দিগন্তজোড়া তুলোর মতো মেঘের সমুদ্র। মনে হয়, এখন থেকে হাত বাড়ালেই আকাশ ছোঁয়া যাবে, ওই মেঘগুলোকে ছোঁয়া যাবে। চারপাশ নিঝুম, কেবল তন্দ্রাচ্ছন্ন অরণ্যের প্রগাঢ় নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে, নিরন্তর। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভেঙে নীচে কোথাও একটা ঝরনার শব্দ শোনা যায়, কিন্তু এই উচ্চতা থেকে সেটাকে পরিষ্কার দেখা যায় না, কেবল দেখা যায় পাহাড়ের দেহে সাদা সুতোর মতো একটা সর্পিল অবয়বের নীরব আলিঙ্গন। দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায়, গরিব এক গৃহস্থের জুম ঘরের দাওয়ায় জড়ো হয়েছিল ওরা।

পুব আকাশে এই এক্ষুনি রক্তিম আভা দেখা দিল। বিশাল পাহাড়ের চূড়াগুলো সোনার মুকুটের মতো জ্বলজ্বল করে উঠল। ঘন জঙ্গলের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের প্রথম সোনালি রশ্মিগুলো যখন তির্যকভাবে নীচে নেমে এল, দেখে মনে হলো বনের অন্ধকার কাটাতে আকাশ থেকে কেউ যেন আলোর ঝরনাধারা নামিয়ে দিয়েছে। সেই আলোর ছোঁয়ায় গাছের পাতায় জমে থাকা

শিশিরবিন্দুগুলো নিমেষে হিরের কুচির মতো চিকচিক করে উঠল। বনের নিস্তব্ধতা ভেঙে জেগে উঠল নাম-না-জানা হাজারো পাখি। তাদের কলকাকলিতে পাহাড়ের প্রতিটি ভাঁজ মুখরিত হয়ে উঠল।

''বড়ো সুন্দর তোমাদের এই পাহাড়,'' বলল সেই নারী, ''এমন সুন্দর জায়গায় থেকেও জেহাদিরা কেন যে জেহাদ আর হিংস্রতা ভুলতে পারে না, কে জানে!''

মায়ার চোয়ালের কঠিন ভঙ্গিমা বুঝিয়ে দিল, প্রকৃতির বন্দনায় আপাতত কোনো উৎসাহ নেই ওর।

''আমার নাম মাতঙ্গী,'' বলল সেই নারী, ''তোমরা কে, তা আমি জানি। এবার বলো, চট্টলা দুর্গে কী করতে ঢুকেছিলে তোমরা, গতকাল রাতে? ড্রোন সেন্টার ধ্বংস করতে?''

''হ্যাঁ, কিন্তু ...'' বলার চেষ্টা করল মায়া।

''তোমাদের কোনো ধারণাই নেই,'' মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, ''শুধু ড্রোন সেন্টার নয়, ওটাকে একটা দূরপাল্লার মিসাইল লঞ্চ ও কমান্ড সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি, পাকিস্তান থেকে একটা ডুবোজাহাজ বোঝাই করে পরমাণু বোমাবাহী ক্ষেপণাস্ত্র রওনা হয়েছে চট্টলা বন্দরের উদ্দেশে। ওদের পরিকল্পনা ছিল, সেগুলোকে এখানে মোতায়েন করা, আর এখান থেকেই ভারতের সম্পূর্ণ পূর্ব উপকূলকে নিশানায় নিয়ে আসা।''

''আপনি কি ভারতের গুপ্তচর?'' বলল মায়া।

''এককালে ছিলাম,'' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মাতঙ্গী, ''এখন অবসর নিয়ে একটা এনজিও চালাই।''

''এনজিও?'' মায়ার মনে সন্দেহ, ''কী রকমের এনজিও?''

''এপার ওপার দুই বঙ্গকে জেহাদিমুক্ত করাই আমাদের এনজিও-র উদ্দেশ্য।''

''কাল রাতে ওখানে কী করছিলেন?''

''তোমাদের কাছে কিছু লুকোবো না,'' বলল মাতঙ্গী, ''কারণ তোমাদের সাহায্য চাই আমার। এই অঞ্চলে ভারতের এমন কোনো সক্রিয় এজেন্ট আপাতত নেই, যে এই কাজটা করতে পারে। তাই আমার সাহায্য চেয়েছিল ওরা। আমার কাজটা খুবই ছোটো ছিল। দুর্গে ঢুকে দেখলাম, খবর সত্যি কিনা, ওখানে সত্যিই মিসাইল সেন্টার গড়ে উঠেছে কিনা। দেখে কনফার্ম করলাম, আর একটা জিপিএস ট্র্যাকার রেখে এলাম, যার সিগন্যাল অনুসরণ করে ভারতের একটা ব্রহ্মস্-এস মিসাইল মিজোরাম থেকে উড়ে এসে মিসাইল সেন্টারটা উড়িয়ে দিল। নতুন প্রজন্মের ব্রহ্মস্ এগুলো, সম্পূর্ণ স্টেল্থ বা অদৃশ্য। তা, সেই জিপিএস ট্র্যাকার রেখে যখন আমি বেরিয়ে আসছি, এমন সময় দেখি তোমাদের ওই দুড়ুম দাড়ুম কাণ্ডকারখানা। ওসব না করলেও গতকাল রাতে ওই ড্রোন সেন্টার ধ্বংস হতোই। মিছিমিছি তোমরা প্রাণের ঝুঁকি নিতে গিয়েছিলে।''

''আপনাদের মতো ব্রহ্মস্ মিসাইল বা ঘাতক ড্রোন আমাদের নেই,'' ব্যথিত স্বরে বলল মায়া, ''আমাদের যা আছে, তাই দিয়েই আমরা আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। ড্রোন সেন্টারটাকে ধ্বংস করা আমাদের কাছে ছিল বাঁচা-মরার সমস্যা। আমাদের সংগ্রামকে ছোটো করে দেখার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?''

''আমাকে ভুল বুঝো না,'' মায়ার হাত ধরে আর্দ্রস্বরে বলল মাতঙ্গী, ''আমি শুধু বলছি, তোমরা সবাই তোমাদের বিদ্রোহের প্রথম সারির নেতা। তার ওপর তোমাদের বড়ো রকমের কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ নেই। গতকাল রাতে তোমরা যা করতে গিয়েছিলে, তাতে তোমাদের সবার প্রাণ যেতে পারতো। তখন কী দশা হতো তোমাদের বিদ্রোহের?''

''আমার জীবন বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ,'' বলল মায়া, ''কিন্তু থুরার কী হলো?''

''আমি যখন তোমাকে কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছিলাম,'' বলল মাতঙ্গী, ''তখন একজন লোক আমাদের কভার ফায়ার দিচ্ছিল। সেই কি থুরা?''

''তাই হবে,'' বলল মায়া।

''তাকে তো আমার পেছনে আসতে দেখিনি,'' বলল মাতঙ্গী, ''তবে কি সে ধরা পড়ে গেল?''

''কিংবা হয়তো মারা গেছে,'' গলার স্বর ধরে এল মায়ার, ''গুলিতে বা বিস্ফোরণে।''

''এই থুরা কি আরাকান আর্মির থুরা ওয়াই সান?'' প্রশ্ন মাতঙ্গীর।

''হ্যাঁ,'' মায়ার গলা তখন কান্নায় ভেজা।

''তার সম্পর্কে আমি যতদূর শুনেছি,'' মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, ''বেঘোরে মারা পড়বার মতো লোক থুরা ওয়াই সান নয়। তুমি তোমার সোর্সদের কাজে লাগাও, আমিও খোঁজ নিচ্ছি। হয়তো সে এখনো বেঁচে আছে।''

চোখ মুছে উঠে বসল মায়া, ''খিদে পেয়েছে,'' বলল অস্ফুটস্বরে।

''সাবধানে বসো,'' বলল নীলা, ''গুলিগুলো পেশী ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু গভীর ক্ষত রেখে গেছে। একটু বেশি নড়াচড়া হলেই রক্তক্ষরণ শুরু হবে।''

সকালের মিঠে কড়া রোদ বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে মাচাং ঘরের মেঝেতে আল্পনা আঁকছে। গৃহস্থ দম্পতি মাটির সানকিতে ধোঁয়া ওঠা লাল চালের ভাত নিয়ে এল। চালের ঘ্রাণে মিশে আছে পাহাড়ি মাটির সোঁদা গন্ধ। ভাতের পাশে সযত্নে রাখা কলাপাতা দিয়ে মোড়ানো বাঁশ কোড়লের পদ, মাটির উনুনে ধিমে আঁচে রান্না। মসলার জাঁকজমক নেই, কেবল পাহাড়ি ঝরনার জল আর পাহাড়ি লাল মরিচের ঝালেই অনন্য। খেতে খেতে মাতঙ্গী বলল, ''তোমাদের উদ্দেশ্য, জেহাদিদের অত্যাচার থেকে চট্টলাকে মুক্ত করা। উলটোদিকে আমার উদ্দেশ্য, চট্টলা যাতে ভারতের পূর্ব উপকূলের বিপদ না হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করা। এখান থেকে ভারতের সম্পূর্ণ পূর্ব উপকূলকে নিশানায় নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে, সেই বিপদ ঘাড়ে নিয়ে ভারতের পক্ষে ইতিহাসে এগিয়ে চলা সম্ভব নয়। যদি আমরা একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে হয়তো দুটো উদ্দেশ্যই

সাধিত হবে।"

''সবার আগে থুরাকে খুঁজে বের করতে হবে," বলল মায়া। সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লো মাতঙ্গী।

''সত্যিই কি আপনার নাম মাতঙ্গী?" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর প্রশ্ন করল মায়া।

''কেন?" অবাক হলো মাতঙ্গী, ''কোনো সন্দেহ আছে?"

''আসলে ব্যাপারটা কী," ইতস্তত করে বলল মায়া, ''এই অঞ্চলে মাতঙ্গী নামের এক তান্ত্রিকের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই পাহাড়েই নাকি তার আনাগোনা। তার কত বয়স, কেউ জানে না। কেউ বলে দেড়শো, কেউ বলে না না, মাতঙ্গী নিতান্তই এক ষোড়শী যুবতী। সে নাকি কোনো খাবারদাবার খায় না, শুধু রক্ত খেয়ে বেঁচে আছে। এককালে নাকি সে দেবীগঞ্জ উপজেলায় থাকত। ওর পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছিল জেহাদিরা, সে কোনোভাবে বেঁচে গিয়েছিল। তারপর ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল, কামরূপ কামাখ্যা পাহাড়ে অনেকদিন তপস্যা করে তন্ত্রসিদ্ধ হয়ে আবার এদেশে ফিরে এসেছিল। এইখানে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে আর অবিশ্বাস্য হয়ে যাচ্ছে। সে নাকি দেবীগঞ্জ উপজেলায় গ্রামে ফিরে গিয়ে যারা যারা ওর পরিবারকে মেরেছিল, তাদের ওপর ভূত লেলিয়ে দিয়েছিল। একে একে সবাই নাকি মারা পড়েছিল (স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা ১৪২৮, 'বোধন' উপন্যাস দ্রষ্টব্য)। তারপর থেকেই সেই মাতঙ্গীকে নাকি এই অঞ্চলের নানান জায়গায় দেখা যায়। সে নাকি পোষা কুমিরের পিঠে চড়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। ভূতেদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের সাক্ষী মানে, প্রয়োজন পড়লে ভূতেদের দলবল তার হয়ে লড়াইও করে। এ সবই নিশ্চয়ই গল্পকথা। একে আপনার নাম মাতঙ্গী, তার ওপর আপনার গলায় মুণ্ডমালা। তাই মনে হলো... কিন্তু আপনি তো স্পাই ছিলেন। স্পাই আবার তান্ত্রিক হয় নাকি? তাছাড়া সেই মাতঙ্গী তো একটা কিংবদন্তী মাত্র। ধ্যাৎ, কী সব আবোলতাবোল ভাবছি!"

মাতঙ্গী বোধহয় কথাগুলো ঠিক খেয়াল করল না। ভাঙা জানালায় রাতের শিশির এখনো ঝুলে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালো। সেই ভাঙা চৌকাঠে কখন যে নিঃশব্দে এসে বসেছে একটা সবুজ টিয়াপাখি, কেউ টেরই পায়নি। পাখিটা অদ্ভুত স্থির। যেন সে ডাকতে আসেনি, অপেক্ষা করতে এসেছে। তার লাল ঠোঁটে লেগে আছে পাহাড়ি বুনো ফলের দাগ, গোল লাল চোখদুটো নিবিড়ভাবে তাকিয়ে আছে ঘরের ভেতরের দিকে। মাতঙ্গীর দিকে।



দেওয়াল জুড়ে স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে লেখা আছে, ''কাফের হলো ওয়াজিব-উল-কতল। অবিশ্বাসীর শাস্তি হলো সর-তন-সে-জুদা। আল্লাই মহান। আল্লার কোনো শরিক নেই।"

এ এমন এক জায়গা, যার উল্লেখ কোনো মানচিত্র বা দাপ্তরিক দলিলে নেই। চট্টলার আর্দ্র ও গুমোট পাহাড়ের গভীরে মাটির নীচে তৈরি এই সুড়ঙ্গসম কারাগারটি 'অন্ধকূপ' বললেও কম বলা হয়। ভারী লোহার দরজা যখন গোঙানির মতো শব্দ করে খুলে যায়, তখন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বাসি রক্ত, ইঁদুরের বিষ্ঠা, ঘাম আর স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলার এক বমি উদ্রেককারী গন্ধ। কারাগারের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ এতোটাই ছোটো যে সেখানে একজন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পাথুরে দেওয়ালগুলো থেকে চুঁইয়ে পড়া লোনা জল মেঝেকে সবসময় পিচ্ছিল করে রাখে। এখানে দিন আর রাতের কোনো পার্থক্য নেই। করিডোরে জ্বলে থাকা নিভু নিভু হলদেটে আলো কেবল বন্দিদের মনের ভীতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এখানকার নিস্তব্ধতা এতটাই প্রগাঢ় যে, পাশের ঘর থেকে আসা গোঙানি বা শিকল টানা শব্দও বজ্রপাতের মতো কানে বাজে।

লোকে একে আড়ালে বলে, 'রহমান ঘর'। মানে, দয়ালুর ঘর।

নির্যাতন কক্ষগুলো যেন কোনো বিভীষিকার দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে এসেছে। দেওয়ালের হুকে ঝুলে থাকা জং-ধরা শিকল, মেঝেতে ছোপ ছোপ কালচে রক্তের দাগ আর টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখা ভোঁতা যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলো চিৎকার করে বলে দেয় এখানকার নৃশংসতার গল্প। বাতাসের প্রতিটি ঝাপটায় এখানে মানুষের চরম অসহায়তার হাহাকার মিশে থাকে। যাদের একবার এখানে আনা হয়, তাদের নাম-পরিচয় বাইরের পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে যায়। সাগর-পাহাড়ের গম্ভীর গর্জনের আড়ালে চাপা পড়ে যায় বন্দিদের আর্তনাদ। রহমান ঘরের কথা শুনলে সাধারণ মানুষের রক্ত হিম হয়ে আসে। এ হলো জীবন্ত মানুষের জন্য তৈরি করা এক যান্ত্রিক নরক, যেখান থেকে ফেরার কোনো পথ নেই।

অনেকে বলে, ব্রিটিশ আমলে এখানেই চট্টলা যুববিদ্রোহের নায়কদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এখানেই নাকি সূর্য সেন মাস্টারদার নখ উপড়ানো হয়েছিল। আজকাল এই যন্ত্রনাঘরের মালিক হয়ে বসেছে যে নরপিশাচ, তার নাম পূর্ব খোরাসানের ক্ষমতার অলিন্দে ৫০ শতাংশ সম্ভ্রমের সঙ্গে ৩০ শতাংশ ভয় আর ২০ শতাংশ ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। লোকে বলে, সকালবেলা নামটা শুনলে নাকি পুরো দিনটাই খারাপ যায়। জেনারেল হামিদ উল রহমান। হিন্দু-বৌদ্ধদের খুব ভালোবাসে।

জেনারেলের বাবাও ছিল জেনারেল। পাকিস্তান আর্মির উঠতি সৈনিক ছিল, অপারেশন সার্চলাইটে হিন্দুদের গণহত্যা করে ক্ষমতার শীর্ষে চড়ছিল একটি একটি করে সিঁড়ি। হঠাৎ করেই হাওয়া ঘুরে গেল। হাওয়ামোরগের মতোই দিক বদলে মুক্তিবাহিনীর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিল। স্বাধীনতার পর বীরের সম্মান পেল। ছেলেকে সেই শিক্ষাই দিয়েছিল জেনারেল। খালেদা জিয়ার ব্লু

আইড বয় থেকে শেখ হাসিনার সরকারের জেনারেল হয়ে আজ জামাতিদের চোখের মণি হয়েছে জেনারেল রহমান। হিন্দু-বৌদ্ধদের খুব ভালোবাসে, ঠিক যেমন কসাই ভালোবাসে পশুদের। মাঝেমাঝেই দুঃখ করে বলে জেনারেল, এই জামাতিরা তো দেখছি একটা হিন্দু-বৌদ্ধকেও আর আস্ত রাখবে না! আমার বুড়ো বয়সটা কি তবে নিতান্তই নিরামিষ কাটবে?

''তুমি এতটা নিশ্চিত কীকরে হচ্ছ,'' রেডিয়োতে ফিসফিস করে বলল মাতঙ্গী, ' থুরা এখানেই আছে? এই জায়গাটা দেখে তো মনে হচ্ছে একটা প্রেতপুরী। কোনো দেহধারী মানুষ এখানে থাকতে পারে না!''

''আরিফ সাধারণত ভুল খবর দেয় না,'' কণ্ঠার কাছের বোতাম টিপে বলল মায়া, ''ও আমার ছোটোবেলার বন্ধু। এই অঞ্চলে এক্স-মুসলিম আন্দোলনের পথিকৃৎ ও।''

জলনিকাশি নালার মধ্যে উপুড় হয়ে লুকিয়ে ছিল মায়া, সবটুকু মনঃসংযোগ দিয়ে দেখছিল জেলের সুরক্ষা ব্যবস্থা আর পাহারাদারদের যাওয়া-আসা। থুরার ট্রেনিঙের প্রতিটা শিক্ষা মনে মনে আওড়াচ্ছিল। প্রতি কুড়ি সেকেন্ড অন্তর সার্চলাইট এক সেকেন্ডের জন্য একটা থামের আড়ালে পড়ে যায়। ওই এক সেকেন্ড জেলখানার প্রবেশদ্বার অন্ধকার থাকে। ক্ষিপ্রগতিতে সেই এক সেকেন্ডকে ব্যবহার করে পুতিদুর্গন্ধময় শীর্ণ নালার মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে মায়া পৌঁছে গেল জেলখানার ভেতরে। বাতাসে রক্ত ও আরবি উদ-জাতীয় ধূপের গন্ধ মিলেমিশে আছে। মৃত্যু ও বিশ্বাসের গন্ধ একই সঙ্গে । সুদীর্ঘ একটা শ্বাস নিল মায়া। থুরা বলেছিল, একজন গুপ্তচরকে অদৃশ্য হতে হয় না। সে শুধু আশেপাশের পরিবেশের সঙ্গে মিশে যায়, যে পরিবেশ চোখের সামনে থেকেও লোকের কাছে অদৃশ্য।

দেওয়ালে কালো স্লেটের বোর্ড ঝুলছে, তাতে চকখড়ি দিয়ে লেখা আছে --- 'থুরা ওয়াই সান'। পাশে লেখা আছে, 'তিন'।

কণ্ঠার কাছের বোতাম চেপে ধরে মায়া ফিসফিসিয়ে বলল, ''পেয়ে গেছি।''

''যা করবার তা দশ মিনিটের মধ্যে করবে,'' বেতার তরঙ্গের অন্য পার থেকে বলল মাতঙ্গী, ''তারপর তোমাকে বের করে আনবো। কোনখান দিয়ে বেরোবে?''

''তার আর দরকার লাগবে না,'' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মায়া, ''আজ সবকিছুর শেষ হবে। এখানেই।''

''তার মানে?'' চমকে উঠল মাতঙ্গী, ''মায়া, পাগলামি করো না!''

জবাবে মাইক্রোফোন অফ করে দিল মায়া। সুদীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে কালরূপী কৃষ্ণতারাকে স্মরণ করল, ''ওঁম তারে তুত্তারে তুরে, সর্ব বিদ্যা আবরণয়ে, ভ্যে ফট স্বাহা!'' তারপর মেন্টেনেন্স শ্যারে অপরিসর নিম্নমুখী সুড়ঙ্গের মধ্যে নিজের ঋজু শরীরটাকে গলিয়ে দিল। কয়েক মিনিট পর ধপ করে বোবা একটা শব্দের সঙ্গে নীচের তলায় অবতরণ করল। সেখানে পাহারারত সৈনিক শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালো। একটা ছোট্ট ধারালো বাঁশের কঞ্চি সৈনিকের কণ্ঠা ভেদ করল নির্ভুল লক্ষ্যে।

ফাঁকা ঘর। পাশের ঘর থেকেই শব্দ আসছে। ঘরের জায়গায় জায়গায় টাইম-ডিলে প্ল্যাস্টিক বিস্ফোরক লাগিয়ে দিল মায়া। সবুজ আলো জ্বলে উঠল। টাইমার নীরবে গণনা শুরু করল।

লোহার দরজা সন্তর্পণে খুলল। ভেতর থেকে আসা পচা রক্ত আর লোনা ধরা দেওয়ালের ভ্যাপসা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল। টর্চার চেম্বারের টিমটিমে হলুদ আলোয় থুরাকে দেখতে পেল। ঘরের একপাশে একটা নোংরা বিছানা। ছাদ থেকে ঝোলানো জং-ধরা শিকলগুলো থুরার কবজি কামড়ে ধরে আছে। শরীরটা অবশ হয়ে ঝুলে আছে, সারা গায়ে চাবুকের দাগ আর পোড়া ক্ষতের চিহ্ন। ঘরের একপাশে একটা নোংরা বিছানা। আপাতত আর কেউ নেই সে ঘরে। মায়ার বুকটা একবার কেঁপে উঠলেও ও নিজেকে সামলে নিল। ঘরের কোণ থেকে একটা টুল এনে থুরাকে তার ওপর দাঁড় করলো। তারপর কোমর থেকে সাইলেন্সার বন্দুক বের করে নির্ভুল লক্ষ্যে শিকলের তালা লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল। দুহাতের শিকল খুলে পড়ামাত্র থুরার দেহটা এলিয়ে পড়ল। ক্ষিপ্র হাতে থুরার পতন রোধ করল মায়া, অসাড় দেহটাকে নিজের কাঁধে তুলে নিল। ঝটপট ঘরের দেওয়ালে একটা বিস্ফোরক লাগিয়ে দিল। থুরার অস্ফুট গোঙানি কানে এল — ''মায়া, কেন তুমি এখানে আসতে গেলে? চশমা, আমার চশমাটা '' এই বলে আবার এলিয়ে পড়ল থুরা।

মায়া কোনো কথা না বলে থুরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে করিডোর ধরে এগোল। ঢোকার পথটা সহজ ছিল, বেরোনোর পথটা কিন্তু লম্বা। বাইরে তখন ঝোড়ো বৃষ্টি আর পাহাড়ের গর্জনে আকাশ ভেঙে পড়ছে।

প্রথম মোড়ের আগে থামল মায়া। টুপ টুপ করে ছাদ থেকে জল পড়ছে।

মায়া হাঁটু গেড়ে বসে আয়নার মতো পালিশ করা একটা ছোটো ধাতব টুকরো করিডোরের কোণ দিয়ে এগিয়ে ধরল। প্রতিবিম্বে দেখা গেল একজন সেনা দাঁড়িয়ে আছে। রাইফেল কাঁধে। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে বিরক্ত মুখে সিগারেট টানছে।

মায়া নিঃশব্দে থুরাকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল। তারপর ধীরে ধীরে ছায়ার মধ্যে মিশে গেল।

সেনাটি কিছু টের পাওয়ার আগেই মায়া তার পেছনে পৌঁছে গেল। এক হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। অন্য হাতে ধারালো বাঁশের কঞ্চি ঢুকিয়ে দিল গলার নীচে, কলারবোনের পাশে।

খচ্।

লোকটার শরীর হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। চোখ বিস্ফারিত। চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু মুখ থেকে শুধু গোঙানি বেরোল।

কঞ্চিটা ঘুরিয়ে টেনে বের করল মায়া। গরম রক্ত ফিনকি দিয়ে

ছিটকে পড়ল। ধীরে ধীরে মৃতদেহটা মাটিতে শুইয়ে দিল মায়া, যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে কাউকে।

বিস্ফোরকটা বসালো করিডোরের বৈদ্যুতিক কন্ডুইটের পাশে। সবুজ আলো জ্বলে উঠল, টাইমার নীরবে গণনা শুরু করল।

আবার থুরাকে কাঁধে নিয়ে হাঁটা।

সুড়ঙ্গটা ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। কোথাও কোথাও দেওয়ালের প্লাস্টার খসে ভেতরের স্যাঁতসেঁতে পাথর বেরিয়ে আছে। নোংরা হলদে আলোয় পুরো পথটা দেখতে লাগছে যেন কোনো জীবন্ত প্রাণীর অন্ত্রর অন্তর্ভাগ।

দূরে বুটের শব্দ। ধুপ। ধুপ। ধুপ। দু'জন সেনা টহল দিচ্ছে।

মায়া থুরাকে টেনে একটা খালি সেলের খোলা দরজার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেনাদের টর্চের আলো গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে আবার সরে গেল।

''উপরে নাকি ছাদ ফুঁড়ে পানি ঢুকছে,'' একজন বলল।

''চুপ কর। ক্যাপ্টেন শুনলে —''

ঠিক তখন প্রায়-অচেতন থুরার গলা থেকে চাপা কাশির শব্দ বেরিয়ে গেল।

দু'জন সেনাই থেমে গেল।

ক্ষণিকের স্তব্ধতা।

তারপর ধীরে ধীরে একজন এগিয়ে এল সেলের দিকে। টর্চের আলো এবার সরাসরি মায়ার মুখের ওপর পড়তে যাচ্ছিল—

মায়া অপেক্ষা করছিল এই মুহূর্তটার জন্য।

হঠাৎ নীচ থেকে বেরিয়ে এসে সেনাটার হাঁটুর পেছনে লাথি মারল। লোকটা ভারসাম্য হারিয়ে সামনে ঝুঁকতেই মায়া ওর গলার পাশে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল।

ব্লপ। সাইলেন্সারের দমবন্ধ শব্দ।

লোকটা পড়ে যাওয়ার আগেই মায়া তাকে ধরে ফেলল।

অন্য সেনা রাইফেল তুলতে যাচ্ছিল। এতক্ষণ আধমরা অবস্থায় পড়ে থাকা থুরা আচমকা দেওয়াল থেকে ভাঙা লোহার পাইপ খুলে লোকটার মুখে সজোরে ছুঁড়ে মারল।

ঠাস!

নাক ভেঙে রক্ত ছিটকে পড়ল।

মায়া সুযোগটা নিয়ে সামনে ঝাঁপাল। দু'জন মাটিতে গড়াতে লাগল। সেনাটা মায়ার কবজি চেপে ধরে পিস্তল সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। মায়া কনুই দিয়ে লোকটার গলায় আঘাত করল। দম আটকে এল লোকটার।



তারপর খুব কাছ থেকে — ধাপ!

মায়া নিজের কপাল দিয়ে লোকটার মুখে মারল। দাঁত ভাঙার শব্দ হলো।

সেনাটার হাতদুটো ঢিলে হয়ে যেতেই মায়া ছুরি বের করে লোকটার বুকের নীচে ঢুকিয়ে দিল।

লোকটার শরীর একবার কেঁপে থেমে গেল।

মায়া দেখল, থুরা দেওয়ালে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে। উত্তেজনায় নাক থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

ওরা আবার এগোল।

প্রতিটি মোড়ে মায়া একটা করে বিস্ফোরক বসিয়ে যাচ্ছে—কখনো পাইপলাইনের পাশে, কখনো সাপোর্ট বিমে,

কখনো বৈদ্যুতিক জংশন বক্সে। পুরো জেলখানাটাকে ধীরে ধীরে একটা বিশাল ফাঁদে পরিণত করছে।

উপরে বজ্রপাত হলো। পুরো সুড়ঙ্গ এক মুহূর্তের জন্য সাদা আলোয় ভেসে উঠল।

ঠিক তখনই সামনের মোড়ে দেখা গেল, চারজন সেনা নামছে সিঁড়ি বেয়ে। পরনে বুলেট প্রুফ আর্মার, হাতে শটগান আর ট্যাকটিক্যাল শিল্ড।

মায়া থেমে গেল। দূরত্ব খুব কম। লুকোনোর জায়গা নেই।

সেনাদের একজন ইতিমধ্যে ওদের দেখে ফেলেছে।

''ওখানে—!''

কথা শেষ হওয়ার আগেই মায়া কোমর থেকে ধোঁয়া গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল।

ফট্!

ঘন ধূসর ধোঁয়া মুহূর্তে করিডোর ভরে দিল। তারপর শুরু হলো অন্ধকারের ভেতর হাতাহাতি।

শুধু ভাঙা ছায়া দেখা যাচ্ছে। চাপা চিৎকার। ধাতব সংঘর্ষ।

একজন সেনা ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, ঠিক তখন মায়া দেওয়ালে পা রেখে লাফিয়ে উঠে তার গলায় দুই পা জড়িয়ে শরীরের ওজন দিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলল। লোকটার মাথা কংক্রিটে লেগে বিকট শব্দ হলো।

আরেকজন শটগান তাক করতেই থুরা ওর হাত ধরে উপরের দিকে ঠেলে দিল। গুলি ছাদে আঘাত করে কংক্রিট ঝরিয়ে দিল। মায়া পাশ থেকে এসে ছুরি বসিয়ে দিল লোকটার বগলের নীচে — আর্মারের ফাঁকা জায়গায়।

শেষ সেনাটা অন্ধভাবে গুলি চালাতে চালাতে পিছোচ্ছিল। মায়া মাটিতে পড়ে থাকা রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে ছোট্ট একটা বার্স্ট ছুড়ল।

টাটাট!

লোকটার মাথা ঝাঁকুনি খেল। ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরে বসে পড়ল।

ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে মায়া কয়েক সেকেন্ড হাঁপাতে লাগল। গালে রক্ত, কপালে ধুলো, হাতে কাঁপুনি। দেখল, থুরা মাটিতে এলিয়ে পড়েছে।

আবার থুরাকে কাঁধে তুলে নিল মায়া। এখনো বেরোনোর পথ অনেক বাকি। থুরা ততক্ষণে আবার আচ্ছন্ন, প্রায়-অজ্ঞান। ওদের পেছনে, জেলের প্রতিটি মোড়ে, নীরবে টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে বিস্ফোরণের কাউন্টডাউন।

বৃষ্টির ছাঁট যখন ওদের গায়ে লাগল, তখন থুরার জ্ঞান আবার ফিরতে শুরু করেছে। মায়া আরও শক্ত করে চেপে ধরল থুরার অবশ দেহটাকে। ওর প্রতিটি পেশি আজ বাবার সেই রক্তাক্ত নিথর দেহের আড়ালটা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকূপের শেষ প্রকোষ্ঠের ভারী লৌহকপাট ঠেলে মায়া যখন রক্তাক্ত থুরাকে কাঁধে নিয়ে বের হলো, ঠিক তখনই করিডোরের শেষ মাথায় ফুটে উঠল দীর্ঘ এক ছায়া। বুটের খটখট শব্দে পাথুরে মেঝে কেঁপে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে জেনারেল রহমান—মুখে সেই চেনা ক্রূর হাসি, এই গরমেও হাতে একজোড়া চামড়ার দস্তানা।

'মায়া চাকমা নাকি?' রহমানের কণ্ঠস্বরে বিষাক্ত শীতলতা, 'ইঁদুরকল থেকে ইঁদুর বের করা এতো সহজ নয় হে। তা, একরকম ভালোই হয়েছে। একের বদলে দুই, চৌকি চেপে শুই। তাই না? হিঃ হিঃ!'

মায়া ধীরে ধীরে থুরাকে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল। শরীরের প্রতিটি শিরা অপমান আর প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে। বৌদ্ধবিহারের অগ্নিকাণ্ড, বাবার শেষনিঃশ্বাস আর পাহাড়ের আর্তনাদ ওর কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

''কাজের সময় কথা বলা আমি পছন্দ করি না,'' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মায়া, ''কিন্তু আজ তোর সঙ্গে একটু গল্প করতে ইচ্ছে করছে। তুই নিজেকে যতই দক্ষ খুনি ভাবিস, আসলে তুই একটা আনাড়ি। তোর ব্যর্থতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ তোর এই সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। রাঙ্গুনিয়া বিহার মনে আছে? ভেবেছিলি, সব্বাইকে মেরে ফেলেছিস। ভুল!''

রহমান চকিতে কোমর থেকে রিভলবার বের করল। মায়া কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করল না, কোমর থেকে দা বের করে বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রহমানের ওপর, এক কোপে রিভলবার শুদ্ধ হাতটা কবজি থেকে কেটে ফেলল। যন্ত্রণায় চিৎকার করার চেষ্টা করল রহমান। ওর টুঁটি চেপে ধরে সে শব্দ বন্ধ করে দিল, দেওয়ালে সজোরে আছড়ে ফেলল রহমানের ছটফট করা কলেবরটাকে। আগুনের মতো লাল মায়ার চোখ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এই দিনটার জন্য আমি প্রতিটি শ্বাস গুনেছি, জেনারেল। রাঙ্গুনিয়া থেকে বেঁচে ফেরার পর থেকে প্রতিটি শ্বাস। ওঁম তারে!'

মিলিটারি ইউনিফর্ম ভেদ করে দায়ের ফলা ঢুকে গেল, প্রায় এক ইঞ্চি প্রবেশ করল জেনারেলের পাঁজরের ফাঁক দিয়ে। শেষ চেষ্টায় জেনারেল বাঁ-হাত দিয়ে মায়ার কবজি আঁকড়ে ধরল। প্রাণপণ চেষ্টায় বাধা দিল, দা যাতে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ না করে। ইতিমধ্যে জনাতিনেক সৈনিক ঢুকে পড়েছে, তাদের উদ্যত বন্দুক মায়ার দিকে তাক করা। জেনারেলের কাটা হাতটা নিমেষে তুলে নিল থুরা, সেই কাটা হাতে ধরা বন্দুক থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়ে ভেদ করল উদ্যত সৈনিকদের মাথা। ছিটকে পড়ল রক্ত আর ঘিলু। সেই মুহূর্তে পেরিকার্ডিয়াল স্যাক ভেদ করে দা-এর ফলা প্রবেশ করল জেনারেলের হৃৎপিণ্ডে। জেনারেলের চোখের উদ্ধত আলো ধীরে ধীরে নিভে এল। নিথর দেহটা যখন অন্ধকূপের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে আছড়ে পড়ল, মায়া সুদীর্ঘ একটা শ্বাস নিল। বাতাসের আর্দ্রতায় তখন আর বারুদের গন্ধ নেই, বরং আছে এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুক্তির স্বাদ।

''হা-হা-হা-হা-হা!'' পাগলের মতো অট্টহাসি হেসে উঠল

মায়া।

তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, রক্তাক্ত থুরাকে আবার নিজের কাঁধে তুলে নিল। অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে বৃষ্টির শব্দের দিকে এগোতে এগোতে বিড়বিড় করে বলল, 'ফুরেইয়ে, বাবা। ফুরেইয়ে।'

পিছনে তখন সাইরেনের বিকট শব্দ বেজে উঠেছে। সৈন্যরা বুঝে গেছে, শিকার পালিয়ে যাচ্ছে। এক ডজন ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠল রহমান ঘরের প্রাঙ্গণ জুড়ে। পরমুহূর্তেই জঙ্গলের প্রান্ত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে আলোগুলোকে চুরমার করে দিল। মাতঙ্গীর কভার ফায়ারের আড়াল নিয়ে অরণ্যের ঘন অন্ধকারে প্রবেশ করল মায়া।

তার ঠিক পরেই রহমানের দয়ার ঘর মুহুর্মুহু বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল।

পিচ্ছিল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে থুরাকে নিয়ে মায়া যখন জঙ্গলের গভীরে মিলিয়ে গেল, তখন পেছনে ফেলে আসা সেই লেলিহান টর্চার চেম্বার পাহাড়ের গায়ে একটা উজ্জ্বল জোনাকির মতো দেখাচ্ছিল। পাহাড়ের গহন জঙ্গলের বৃষ্টি আজ ধুয়ে দিয়ে গেল বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা লাঞ্ছনার রক্তদাগ।



প্রায় এক দিন পরে, জঙ্গলের মধ্যে একটা ত্রিপল-ঢাকা আস্তানায় থুরা চোখ মেলল। মুখজোড়া সরল হাসি, চোখে কৌতুক। এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, লোকটাকে কি কিছুই বিন্দুমাত্র স্পর্শ করছে না? অবাক হলো মায়া। নীলা নাড়ি ধরে বসে ছিল, মাথা নেড়ে হেসে বলল, ''মুনুষ্যা বাচি গেইজ্জে! কচ্ছপের জান তোমার, থুরা!''

মায়া তড়িঘড়ি এসে থুরার পাশে বিছানায় বসল। উঠে বসার চেষ্টা করছিল থুরা, জোর করে ওকে শুইয়ে দিল।

''উঁহু উঁহু,'' মাথা নেড়ে বলল থুরা, ''আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না!''

''তাহলে কী করবেন এখন?'' ভুরু কুঁচকে বলল মায়া।

''আমার চশমা কোথায়, চশমা?'' থুরা হঠাৎই উচাটন হয়ে উঠল।

ঘাবড়ে গিয়ে নীলা তড়িঘড়ি করে চশমা খুঁজতে গেল। থুরা আবার বলে উঠল, ''চশমাটা কোথায় ফেললে তোমরা? হারিয়ে ফেললে নাকি? রহমান ঘর থেকে পালানোর সময় চশমাটা তো আমার নাকের ডগাতেই ছিল, ঠিক মনে আছে। ও ফায়া ফায়া, এখন আমি চশমা কোথায় পাই? চশমা ছাড়া আমি তো কিছুই ঠিকঠাক দেখতে পাই না। আখু বা-ফ্রিক-পো-লে, ফায়া ফায়া।''

বিরক্ত হলো মায়া। যে লোকটা এত যুদ্ধ জয় করেছে, এত কঠিন পরিস্থিতিতেও তার হেলদোল হয় না, সে কীকরে সামান্য একটা চশমা নিয়ে মাথা খারাপ করে?

''এই তো, এখানেই আছে,'' ভুরু কুঁচকে চশমার খাপটাকে বালিশের পাশ থেকে তুলে থুরার দিকে এগিয়ে দিল মায়া, ''যে জিনিসটা হাতের কাছেই আছে, সেটা নিয়ে পাড়া মাথায় করছেন কেন? আর কত্তবার বলেছি আপনাকে, আরাকানের ভাষা আমরা ঠিক করে বুঝতে পারি না। আরাকানের ভাষায় কথা বললে আমরা টেনশনে পড়ে যাই।''

''পরপর তিনটে যুদ্ধ আমরা জিতলাম, একের পর এক,'' কথা ঘোরানোর জন্য হেসে বলল থুরা, ''এই জয়কে উদ্‌যাপন করা হবে না? আমরা তো আরাকানে যুদ্ধে জিতলেই সবাই মিলে ভোজ লাগাই। তোমাদের চট্টলার আতিথেয়তার কথা আমরা শুনে থাকি, কোথায় সেই চট্টলার বিখ্যাত ভোজ?''

পাগলা বুড়ো একটা! ঠিক বাবার মতো! মুচকি হেসে মায়া বলল, ''আমরা সেটা আগেই ভেবে রেখেছি। বোধিচিত্ত, সুগন্ধ তো ভালোই আসছে। রান্না হয়ে গিয়ে থাকলে ওসব নিয়ে এসো ভাই। আরে, মাতঙ্গী কোথায়? তাকে দেখছি না তো?''

''উনি তো,'' একটু ইতস্তত করে বলল নীলা, ''মানে, রাতে তো কখনোই ওঁকে আশেপাশে দেখি না। কোথায় গিয়ে যে উনি ঘুম লাগান, কে জানে!''

ঠিক এই সময় মাতঙ্গী ঢুকলো ত্রিপল সরিয়ে, ''এই যে থুরা, জ্ঞান ফিরেছে? বাঃ, খুব ভালো। মায়া, খিদে পেয়েছে। রান্নার গন্ধ পাচ্ছি, কী বানাচ্ছো তোমরা?''

মাটির সানকিতে ধোঁয়া ওঠা লাল চালের ভাত। থালার এক কোণায় জুমের খেত থেকে তুলে আনা তাজা বেগুন আর মিষ্টি কুমড়োর লতা দিয়ে তৈরি ঘন সিঁদল ঝোল, ভেতরে ছোটো ছোটো পাহাড়ি কাঁকড়ার টুকরো। অন্য কোণায় পাথরের হামানদিস্তায় থেঁতো করা নাপ্পি ও পোড়া মরিচের ভর্তা। সেই ঝালের তীব্রতা এমনই মারাত্মক, যে সবার কপাল চুঁইয়ে ঘাম আর নাকের ডগার জল এসে গেল। সঙ্গে গাছ থেকে পেড়ে আনা টক-মিষ্টি পাহাড়ি লেবু। শেষে বাঁশের চোঙায় শীতল ঝরনার জল। চারদিকের নিস্তব্ধতার মাঝে ঝরনার একটানা ঝরঝর শব্দ, এই অনাড়ম্বর ভোজটি পেটের চেয়ে বেশি আত্মাকে শান্তি দিল।

খাওয়ায় শেষে হাত ধুয়ে থুরা নিজের সামরিক ইউনিফর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একটা পুরোনো হলদে হয়ে ওঠা তুলোট কাগজ। তাতে বাংলা হরফে লেখা, 'সংগ্রাম শেষ হয় না, শুধু তার রূপ পরিবর্তন করে।' নীচে সই, 'সুভাষ চন্দ্র বোস'। সেই কাগজে মোড়া ছিল একটা জং-ধরা ব্যাজ। আট-মুখী তারা, তার মধ্যে দুই উদ্যত তলোয়ার। ভেতরে সূর্যরশ্মির কেন্দ্রে বাঘের মুখ, সঙ্গে লেখা 'আজাদ হিন্দ'। কাগজ আর ব্যাজটা মাথায় ঠেকালো থুরা।

মাতঙ্গী আলতো করে স্পর্শ করল কাগজটা। সারা শরীরে কাঁটা

দিল, কেঁপে উঠল ও।

''এটা ওঁর হাতের লেখা,'' অস্ফুট স্বরে বলল মাতঙ্গী।

দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল থুরা, ''আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ওঁর ছায়া, ওঁর একনিষ্ঠ শিষ্য। উনি আমার ঠাকুর্দাকে বলেছিলেন, পূর্বদিকে যাও। স্বাধীনতার যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় কোথায় আছে, খুঁজে বের করো।''

''হয়তো এটাই সেই যুদ্ধ। আমাদের বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য।'' বলল মাতঙ্গী।

''আমরা নিরস্ত্রদের সশস্ত্র করেছি, শত্রুকে অন্ধ করেছি। জনবিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। এরপর কী?'' প্রশ্ন মায়ার।

''এধরনের যুদ্ধের নির্দিষ্ট কয়েকটা ধাপ রয়েছে,'' বলল থুরা, ''আমরা আরাকানেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলাম। প্রথম ধাপ, নিরস্ত্রদের সশস্ত্র করা, যাতে নির্যাতিত জনতা প্রতিরোধ শুরু করে। দ্বিতীয় ধাপ হলো শত্রুর ইন্টেলিজেন্স পরিকাঠামো ধ্বংস করে তাদের অন্ধ করে দেওয়া। এই দুটোতে তোমরা সফল হয়েছ। এরপর আরও কয়েকটা ধাপ রয়েছে। তৃতীয় ধাপে চট্টলা ও শাহ্জালালাবাদের সংযোগস্থলকে কেটে ফেলতে হবে। স্ট্র্যাটেজিক আইসোলেশন। চতুর্থ ধাপ, স্থানীয় সরকারি প্রতিভূদের আত্মসমর্পণ বা পলায়ন। পঞ্চম ধাপ, তোমাদের নিজেদের সরকার গড়ে তোলা। ষষ্ঠ বা সবশেষ ধাপ, সেই সরকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।''

''মাস্টারদা সূর্য সেন একই চেষ্টা করেছিলেন,'' বলল মাতঙ্গী, ''তৃতীয় ধাপেই ব্যর্থতা এসেছিল। স্ট্র্যাটেজিক আইসোলেশন কাজটা সহজ নয়।''

ঘরে নীরবতা নেমে এল। আবার বৃষ্টি শুরু হলো। ধীরে, কিন্তু নিরন্তর। মাতঙ্গী একটু দূরে আড়ালে গিয়ে পদ্মাসনে ধ্যানে বসল। চশমার খাপ থেকে ছোট্ট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে থুরা ওর চশমার ডাঁটি টাইট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একবার চশমা পরছে, তারপর মাথা নেড়ে চশমা খুলে আবার খুটখাট করছে, আবার চশমা পরছে — এই চলছে বারবার। কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না।



(নাগাল্যান্ড, ভারত)

সূর্য নীল পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ প্রকৃতি এক মায়াবী রূপ ধারণ করল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা ছোটো ছোটো গ্রামগুলোতে তখন সন্ধ্যার মায়াজাল নেমে আসছে। গ্রাম জুড়ে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। উঠোনে দরজার পাশে টাঙানো দা আর ঝুড়ি বলে দিচ্ছে, আজকের মতো কাজ শেষ, এখন শুধুই অবসর। বাঁশ আর কাঠের তৈরি দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বিকেলের শেষ আলোটুকু মিলিয়ে যেতেই ঘরের ভেতরে জ্বলে উঠল 'থাপ্পু' বা মাটির উনুন। দূর থেকে খংখাইয়ের গলার স্বর ভেসে এল, ''মেহুল, নো ক্যা লি বা, আ নুও? কোথায় গেলি, বাপ্ আমার?''

নাগাল্যান্ডের এই পেরেন জেলাটাকে লোকে 'সবুজ জেলা' বলে, সেটা অকারণে নয়। পাহাড়ের বুক চিরে কুয়াশার পাতলা চাদর ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে, যেন ধরিত্রীর শ্বাস। দূরে পাইন আর ওক গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ বিকেলের রক্তিম আভা জুম চাষের জমিতে পড়েছে, মনে হয় কোনো দক্ষ শিল্পী সযত্নে সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছেন সবুজ ক্যানভাসে। একটু পরেই বাড়ির দাওয়া থেকে আগুনের হালকা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠতে শুরু করল। বাঁশের তৈরি মাচাং ঘরগুলোর ভেতর থেকে ভেসে আসছে কাঠের উনুনে রান্নার সোঁদা গন্ধ। কাছেই কোথাও রান্না হচ্ছে নাগাদের প্রিয় বাসতেঙ্গা ওয়োকো সো রুজন, গাঁজন করা টক বাঁশ কোড়ল আর নাগা লঙ্কা দিয়ে রান্না করা জংলি বরাহের মাংস। পাহাড়ের হিমেল হাওয়ায় সেই সুবাস মিলেমিশে এক অলৌকিক প্রশান্তি তৈরি করেছে। আদিম অরণ্যের গন্ধে ঘেরা সেই সন্ধ্যায়, গ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তে আগুনের পাশে বসে ছিল বৃদ্ধ খংখাই। ''মেহুল, কোথায় গেলি রে তুই? ঠাণ্ডা পড়ছে, আগুনটা একটু জ্বালিয়ে দে, বাপ্!''

হাতের কুঠার আর কাঁধের পাঁজা কাঠ মাটিতে নামিয়ে রেখে বুড়ো খংখাইয়ের পাশে এসে বসল তার নাতি, মেহুল। পাহাড়ি রাতের পতঙ্গরা নেমে এসেছে লোকালয়ে। ঝিঁঝিঁর ডাকে মাথা ঝিমঝিম করে। গাছের ডালপালায় পাখিদের ঘরে ফেরার কলকাকলি ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। পাহাড়ের ঢালে ছোটো ছোটো ঘরগুলোর জানালা দিয়ে একে একে আলো জ্বলে উঠল, মনে হলো আকাশের তারাগুলো যেন মাটির বুকে নেমে এসেছে। শীতল হাওয়ার ঝাপটা আর ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ঐকতানে ঘেরা সেই নির্জনতার এক গভীর গাম্ভীর্য থাকে। আধুনিক পৃথিবীর কোলাহল থেকে দূরে, পাহাড়ের এই গভীরে সন্ধ্যা নামে এক শান্ত, প্রাচীন অথচ প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে। যেখানে প্রতিটি পাথরে আর ঝরনার শব্দে মিশে থাকে পূর্বজদের হাজার হাজার বছরের স্মৃতি।

কাঠের টুকরোগুলোকে গম্বুজের মতো করে সাজিয়ে তাতে আগুন দিল মেহুল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'পৌ, তুমি গতকাল মায়ানমারের সীমান্ত এলাকায় গিয়েছিলে, তাই না? আমি বুঝতে পারি। ওখানে গেলেই তোমার মন খারাপ হয়ে যায়, আর সেই মনখারাপ থাকে পুরো একটা সপ্তাহ। আচ্ছা বলো তো পৌ, তুমি রোজ সন্ধ্যেবেলা কেন ওভাবে সীমান্তের ওপারের দিকে তাকিয়ে থাকো? ওখানে তো ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই।'

খংখাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওটা তো কেবল জঙ্গল নয় রে মেহুল, ওটা আমাদের শরীরের একটা কেটে ফেলা অংশ। এক সময় এই পাহাড়গুলোর মাঝে কোনো বেড়া ছিল না। আমাদের শিকারের পথ, উৎসবের গান আর বিয়ের

সম্বন্ধ এই পাহাড়ের এপার-ওপার জুড়ে বিনা বাধায় বয়ে যেত।'

মেহুল অবাক হয়ে বলল, 'তাহলে এই কাঁটাতার এল কেন? কে নিয়ে এল? আমাদের ইতিহাস বইতে তো এসব কিছুই লেখা নেই।'

বৃদ্ধের গলায় বিষণ্ণতা নেমে এল, 'সাগরপার থেকে আসা সাদা মানুষেরা সাঁইত্রিশ সালে ম্যাপের ওপর কলম চালিয়ে দিল। তারা বুঝল না যে একটা পাহাড়কে ভাগ করা মানে একটা জাতির হৃদয় চিরে ফেলা। আমাদের ভাই-বোনেরা রাতারাতি অন্য দেশের মানুষ হয়ে গেল। আজ আমাদের উৎসবের ঢোল এপারে বাজলে ওপারে প্রতিধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু আমরা একে অপরের হাত ধরতে পারি না। এই বিভাজন আমাদের রক্তকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে।'

মেহুল ওর দাদুর হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, 'এই কষ্ট কি কোনোদিন শেষ হবে না?'

খংখাই মেহুলের চোখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, 'হবে। আমাদের নাগা জনজাতিগুলোকে একজোট করতেই হবে। অনেকে বলে, নাগা জনজাতির বাসস্থানের দুটো টুকরোকে ভারত আর মায়ানমার থেকে আলাদা করে নতুন একটা দেশ তৈরি করতে হবে। জেনে রাখিস, সেটা সবচেয়ে বড়ো ভুল হবে। যদি সেটা করি, তাহলে সাগরপাড়ের সাহেবরা আবার ফিরে আসবে, আমাদের পায়ে বেড়ি পরাবে।"

"তাহলে?" মেহুলের গলাটা অসহায় শোনালো।

"এটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিস যে, হিন্দুরা এখন দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবি, হিন্দুরা আর আমরা আসলে একই। ওরাও প্রকৃতির পুজো করে, আমরাও এককালে প্রকৃতির পুজো করতাম। আমাদের সব উৎসব আজও প্রকৃতি নির্ভর। ওরা প্রকৃতিকে জন্মদাত্রী মা বলে মানে, আমরাও তাই। উকে-পেনু-ও-পফু মানে জন্মদাত্রী, জানিস তো? তাই হিন্দুদেরকে সঙ্গে নিয়েই কিছু করতে হবে।"

"ঠিক করে বলো তো দাদু," চশমাটা নাকের ডগায় সোজা করে বসিয়ে বলল মেহুল, "কীকরে আমরা নাগারা আবার এক হবো?"

"উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের আগে তো এ সমস্যা ছিল না," বলল খংখাই, "তখনকার ম্যাপ দেখেছিস? মায়ানমার তখন ভারতের মধ্যেই ছিল। আমরা নাগারা আবার এক হবো, যদি কোনোদিন ভারত আবার আগের সেই অখণ্ড রূপ ফিরে পায়। যেদিন সীমান্ত থাকবে না, সেদিন পূর্ব থেকে পশ্চিম সব ভাই আবার এক হবে। ভারত যদি আবার এক হয়, তবেই আমাদের নাগাভূমি তার পূর্ণতা ফিরে পাবে। সেদিন আমি আর সীমান্তে দাঁড়িয়ে কাঁদবো না, বরং বুক ফুলিয়ে ওপারে গিয়ে আমার হারানো আত্মীয়দের জড়িয়ে ধরব। ওখানে জমি কিনব। বলা যায় না, পছন্দ হয়ে গেলে ওখানকার একটা সুন্দরী দেখে মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে পারি।'

কাঠের একটা টুকরো দিয়ে আগুনটা উসকে দিল খংখাই। আগুনের শিখাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাঠ পোড়ার সেই চিরচেনা শব্দ — চটপট চটপট করে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ার শব্দটা জোরালো হয়ে উঠল, তার সঙ্গে মিশে গেল পাইন কাঠের মিষ্টি সুগন্ধ, ধূপের মতো গন্ধ। আগুনের সেই আলো মেহুলে চোখেও।

"সেটা কি কোনোদিনও হবে, দাদু?" মেহুলের গলায় তবু অবিশ্বাসের সুর, "বরং উল্টোটাই তো হবে শুনছি। পূর্ব খোরাসানের নেতারা বলছে, খুব শিগগিরই শিলিগুড়ির গলা কেটে ওরা এই উত্তর-পূর্বকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তারপর তুর্কি আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ওরা ঢুকে পড়বে এখানে, পুরো উত্তর-পূর্ব ভারত দখল করে মুসলমান দেশ বানাবে।"

"গলা কাটবে!" বুড়ো খংখাইয়ের চোখে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল, "সাহেবরা আমাদের কী বলে জানিস? 'হেড হান্টার'! এসে দেখুক না এদিকে, দাও দিয়ে সব জেহাদির মাথা কেটে মাথাগুলো দরজার ওপর টাঙিয়ে রাখবো।"

"হ্যাঁ," হেসে বলল মেহুল, "এমনিতেও গত পঞ্চাশ বছরে একটাও নতুন মাথা জোগাড় হয়নি, দরজার চৌকাঠটা কেমন যেন খালি খালি লাগছে, তাই না? আচ্ছা দাদু, এই যে আমরা কাটা মুণ্ডু দরজার ওপর সাজিয়ে রাখি, সেটা কেন করি? বিদেশিরা তো এজন্য আমাদের অসভ্য ভাবে।"

"নাগাদের বিশ্বাস," হেসে বলল খংখাই, "শত্রুর মাথা ছিনিয়ে নেওয়া মানে তার আত্মাকে বন্দি করে তার শক্তিকে হজম করে নেওয়া।"

"তুমি সেটা বিশ্বাস করো?" প্রশ্ন মেহুলের।

"হিন্দু তান্ত্রিকদের মধ্যেও কিন্তু এরকমই একটা বিশ্বাস আছে," বলল খংখাই, "ওরা মৃতদেহের ওপর বসে ধ্যান করে, মৃতের সব শক্তি শুষে নিয়ে শক্তিশালী হওয়ার জন্য। কিন্তু তুই তো এসব বিশ্বাস করবি না। তাই বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপারে গিয়ে দেখ। দেখতে পাবি, এটা হলো শত্রুর মনে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করার এক প্রাচীন কৌশল। খুব কাজের কৌশল এটা।"

"বুঝলাম," হেসে বলল মেহুল, "কিন্তু আমি বলি কী, জেহাদিরা চড়াও হলে তারপর আমরা দাও নিয়ে ভয় দেখাতে বেরোবো, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। তারচেয়ে বরং এখন থেকেই কিছু করা ভালো। তুমি তো আমাদের 'গাওঁবুড়া', আগামী গ্রাম পঞ্চায়েত মিটিঙে কথাটা তোলো না কেন?"

"করব, বাপ্ আমার," হেসে বলল বুড়ো খংখাই, "তার আগে বল, দাও কীভাবে ঠিক করে শান দিতে হয়, সেটা তোকে শিখিয়েছিলাম, মনে আছে তো? নাকি গুয়াহাটিতে আর্মি কলেজে লেখাপড়া করতে গিয়ে সব ভুলে গেছিস?"

"আমি গুয়াহাটিতে খুব কম সময়েই থাকি," কঠোরস্বরে বলল মেহুল, "বেশিরভাগ সময় তো আমার কাটে জেনজিবে ট্রেনিং

ক্যাম্পে। আর্মির প্রশিক্ষণ কী জিনিস, তুমি জানো না? তিরিশ কেজি ভারী পিঠের ব্যাগ আর অস্ত্র-সহ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠা-নামা করতে হয়। মাইনাস তাপমাত্রার মধ্যে, মুষলধারে অতিবৃষ্টির মধ্যেও ট্রেনিং চলে। কোনো রসদ বা খাবার ছাড়া কীভাবে ঘন জঙ্গলে দিনের পর দিন বেঁচে থাকতে হয়, সেটা তুমি ছোটোবেলায় শিখিয়েছিলে। একই ট্রেনিং আর্মিও দিচ্ছে, নতুন অনেক টেকনিক শিখছি। তোমার কোনো শিক্ষাই আমি ভুলিনি। তুমি দা চালাতে শিখিয়েছিলে, আর্মিতে তার ওপর নতুন নতুন দাও চালানোর টেকনিক শিখেছি। কিন্তু দাও দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না, পৌ। তুমি ভাবছো মায়ানমারে আটকে পড়া আমাদের ভাই-বোনদের কথা। আর আমি ভাবছি শিলিগুড়ির কথা। যদি পূর্ব খোরাসান শিলিগুড়িতে ঢুকে পড়ে, তাহলে আমরা তো রসদের অভাবে বেঘোরে মারা পড়ব।"

"তুই শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত আজকালকার ছেলে," মাথা নেড়ে বলল খংখাই, "নাগা হওয়ার মানেটা কী, আজও বুঝলি না। নাগা রসদের অভাবে মরে না, মরে যখন সে নাগা হওয়া ভুলে যায়। আর তাছাড়া আমাদের এত নাচার ভাবছিস কেন? ওরা শিলিগুড়িতে ঢুকলে আমরাও ঢুকে পড়ব!"

"কোথায় ঢুকবে?" মেহুলের গলায় সন্দেহ।

"এই তো," হাত বাড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে দেখায় বুড়ো, "এই পাহাড়ের শিরা বরাবর চললে সোজা পৌঁছে যাবো ত্রিপুরা। ত্রিপুরা আর সমুদ্রের মাঝে আছে শুধু এক চিলতে জমি —নোয়াখালী! নাগাল্যান্ডে তখন রসদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে জাহাজে করে আসবে। হা হা হা হাঃ!"

দূরে কোথাও একটা পাহাড়ি নেকড়ে ডেকে উঠল। কুয়াশাচ্ছন্ন নাগা পাহাড়ের নিস্তব্ধতা পেরিয়ে সেই শব্দ যেন কোনো প্রাচীন আত্মার রণ-আহ্বানের মতো ছড়িয়ে পড়ল উপত্যকায়।

"চল, তোকে আগামী পূর্ণিমায় ভূতজুঁয়া দ্বীপে ঘুরিয়ে আনি। যাবি, আমার সঙ্গে?" বলল খংখাই।



(চট্টলা, পূর্ব খোরাসান)

ভারী কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই নাকে এল পুরনো কাগজ, ভিজে চুন আর ধুলোর ভ্যাপসা গন্ধ। হলরুমটি বিশাল, উঁচু সিলিঙের মাঝখান থেকে বিশালাকার ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। তবে তার কাচের অর্ধেকই ভাঙা, বাকিগুলো ধুলোর আস্তরণে ধূসর। মেঝেতে এককালে দামি মোজাইক ছিল, এখন সেখানে বড়ো বড়ো ফাটল ধরেছে। দেওয়ালের গায়ে বিশাল এক আয়না, যার পারদ চটে গিয়ে এখন ঝাপসা হয়ে গেছে, পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হয় আয়নার ভেতর থেকে অন্য কেউ লক্ষ্য রাখছে। ঘরের এক কোণায় স্তূপ করে রাখা আছে ব্রিটিশ আমলের কিছু ভাঙা আসবাবপত্র ; ইঁদুরের বাসা ভর্তি ভারী সোফা, হাতল ভাঙা চেয়ার, উল্টে থাকা টেবিল আর উইয়ে খাওয়া আলমারি। তারই কয়েকটা চেয়ার, যেগুলো কিছুটা হলেও ব্যবহার করার মতো অবস্থায় আছে, সেগুলোকে টেনে ধুলো ঝেড়ে বসল ওরা।

"কে এই রহিম চৌধুরী লোকটা?" অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে বলল মাতঙ্গী, "কী এমন করেছে লোকটা, যে তাকে এত বিশ্বাস করছ?"

"এই ব্যাপারে কিন্তু আমি একমত," বলল থুরা, "জানা নেই শোনা নেই, শুধুমাত্র এক্স-মুসলিম হওয়ার সুবাদে লোকটাকে আমরা দেখা করার অনুমতি দিয়েছি, খুব বড়ো ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে এটা।"

"লোকটার কথাগুলো একবার শুনে দেখো," আশ্বাসের স্বরে বলল মায়া, "আমি সব দায়িত্ব নিচ্ছি। ওই তো, বোধিচিত্ত ওই কোণায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে, ওর চাদরের নীচে সাইলেন্সার লাগানো বন্দুক আছে। তাছাড়া, ছাদের ওপর থেকে অমিতাভ নজর রাখছে। কোনো গাড়ি এদিকে আসতে দেখলেই ও বোধিচিত্তকে খবর দেবে। এছাড়া বাইরে গলির মোড়ে যে ভাঙা চায়ের দোকানটা দেখলে, সেটা থেকে পুরো বাড়িটার ওপর নজর রাখা যায়। সেখানেও আমাদের লোক রয়েছে।"

ফিরিঙ্গি বাজারের সরু গলির ভেতরে লুকিয়ে থাকা জরাজীর্ণ ভবন, এককালে কোনো হিন্দু জমিদারের পরিচালিত ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহার হতো। ছাদের ওপর থেকে দেখা যায় চাক্তাই খালের ধারের ঘিঞ্জি বস্তি আর দূরে কর্ণফুলী নদীর আবছায়া রেখা। চুন-সুরকির পলেস্তারা-খসা, শ্যাওলা-ধরা বিশাল এক ঔপনিবেশিক আমলের ইমারত। দেওয়ালে ফাটলগুলো মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে আছে, যা দেখে মনে হয় বাড়িটা যে কোনো সময় ভেঙে পড়বে। ভারী কাঠের দরজাগুলো উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে, মরচে ধরা লোহার গ্রিলগুলোর অধিকাংশই চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে। যেগুলো রয়ে গেছে, সেগুলোকে রদ্দির দামে বিকোলেও কিছু পাওয়া যাবে না। ভেতরে ভ্যাপসা গন্ধ, অন্ধকারে চামচিকের ডানার ঝাপটানি, আর হঠাৎ হঠাৎ করে কাঠের মড়মড় শব্দ।

পাশের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সবাই ওদিকে তাকাল। সাধারণ সুতির কুর্তা পাজামা পরা এক প্রৌঢ় ভেতরে এল। বয়স চল্লিশের কোঠায়, মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার সঙ্গে সংকল্পের ছাপ। হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা চামড়ার পুঁটলি। ঘরে ঢুকে একটু নাক কুঁচকালো, বোধহয় ঘরের দুর্গন্ধের জন্য।

"আপনার নাম কী?" প্রশ্ন করল থুরা।

"রহিম চৌধুরী, বাবা ব্রহ্মপুত্রের দয়া।"

"ব্রহ্মপুত্রে আজ ইলিশ উঠেছে?" প্রশ্ন থুরার।

"ইলিশ নয়, বোয়াল উঠেছে," বলল রহিম, "বেয়াল্লিশ টাকা

কিলো।"

মাতঙ্গী পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে রহিমের দেওয়া উত্তরগুলো মিলিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

"বসুন," সামনের চেয়ারের দিকে নির্দেশ করে বলল মায়া।

লোকটাকে দেখেই মনে হয় খুব সাবধানি, গুছিয়ে কাজ করে। প্রথমে ঘরের কোণা থেকে একটা টেবিল খুঁজে বার করে সেটাকে ধুলো ঝেড়ে টেনে আনলো। তারপর চেয়ারটাকে তার সামনে টেনে বসল। পরম মমতায় চামড়ার পুঁটুলি খুলে পুরনো ভঙ্গুর একটা ম্যাপ আর ন্যাপথলিন গন্ধী হলদে কয়েকটা ফাইল খুলে সামনে মেলে ধরল। থুরা সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখল, ঔপনিবেশিক আমলের সিলমারা একটা জীর্ণ টেলিগ্রাম আর হাতে আঁকা নোয়াখালী ও চট্টলা করিডোরের ট্রানজিট রুট। পাতাগুলো হলুদ হয়ে এসেছে। পুরনো কালিতে একপাশে নোট লেখা ঃ

১. গজওয়া-এ-হিন্দ সফল করতে গেলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২. যতদিন চট্টলা ভারতের সঙ্গে আছে, ততদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

৩. ত্রিপুরা নিশ্চয়ই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে। তাহলে চট্টলার সঙ্গে আমাদের পাকিস্তানের একমাত্র যোগসূত্র হয়ে দাঁড়াবে নোয়াখালী।

৪. নোয়াখালী যদি ভারতে যায়, চট্টলা আমরা কিছুতেই দাবি করতে পারবো না।

৫. রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দাও।

৬. জনবিন্যাস বদলে দাও।

৭. নোয়াখালী দখল করো।

৮. করিডোর বিচ্ছিন্ন করো।

ম্যাপের পাশেই একটা পুরোনো দিনের লাল খেরোখাতার লেজারে ডজনখানেক মিলিশিয়া বাহিনীকে দেওয়া অর্থের হিসাব লেখা ছিল।

"এসব আপনি কোথায় পেলেন?" জিজ্ঞেস করল থুরা।

"আমার পূর্বপুরুষ ছিল নোয়াখালীর হিন্দু জমিদার," বলল রহিম চৌধুরী, "আমার দাদাজী, অর্থাৎ ঠাকুর্দা ছিল পরিবারের ছোটো ছেলে। কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছিল, গরিব মুসলমান প্রজাদের নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করত। এরপর এল নোয়াখালীর সেই জেহাদি অত্যাচারের কালখণ্ড। আমার দাদাজী আগেভাগেই ধর্মান্তরিত হয়ে পাকিস্তানিদের দলে যোগ দিয়ে বেঁচে গেল, পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলা হলো।

আমার জন্ম আর বেড়ে ওঠা নোয়াখালীতেই। চাকরিসূত্রে চট্টলায় পোস্টেড। তবে প্রতি মাসেই আমি নোয়াখালী যাই।

আমি সারাজীবন বিশ্বাস করে এসেছিলাম, নোয়াখালীর জেহাদি আক্রমণ হয়েছিল হিন্দু জমিদারদের দোষে। তারা অত্যাচারী ছিল, তাই মুসলমান প্রজারা খেপে গিয়ে আক্রমণ করেছিল। আমাকে সেটাই শেখানো হয়েছিল। তাই দাদাজীর ইসলাম গ্রহণকে আমি ভাগ্যের বিচার বলেই মনে করতাম। কয়েকবছর আগে ইন্টারনেটে একটা সিনেমা দেখলাম — বেঙ্গল ফাইলস। প্রথমে মনে হয়েছিল, সিনেমাটা হিন্দুদের প্রোপাগান্ডা। কিন্তু একটা সন্দেহের কাঁটা মনে ঢুকে গিয়েছিল। সত্যিটা কী, আর মিথ্যে কোনটা, সেটা তখন থেকেই খোঁজা শুরু করি। যেমন যেমন নতুন তথ্য হাতে আসতে থাকে, তেমন তেমন আমার ঈমান নড়ে যায়। যেটার শুরু মিথ্যে দিয়ে, তার সবটাই তো মিথ্যে, তাই না? আর কতদিন এই মিথ্যে ঈমানের বোঝা বয়ে বেড়াবো? তখন থেকেই আমি স্থানীয় এক্স-মুসলিম সংগঠনের সঙ্গে একটু একটু করে যুক্ত হতে থাকি।

গত মাসে গ্রামে গিয়েছিলাম। পুরনো তোরঙ্গগুলো বের করা হয়েছিল নতুন করে ন্যাপথলিন দেওয়ার জন্য, তার মধ্যে থেকে এই চামড়ার পুঁটুলিটা পাই। তারমধ্যে এসব ছাড়াও একটা চিরকুট ছিল, বোধহয় দাদাজীর লেখা। সেই চিরকুটে দাদাজী শুধু একটা কথাই বারবার লিখেছিল — মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে। এই জীবনটাই মিথ্যে!

দাদাজী ভুল ভাবেনি। এই পুরনো ম্যাপ আর কাগজপত্রগুলো কোনো আদর্শের কথা বলে না, গরিব মানুষের মঙ্গলের কথা বলে





না, বরং তাদের ব্যবহার করে দখলদারির কথা বলে। আধা-সামরিক জেহাদি মিলিশিয়া, সুযোগসন্ধানী দাঙ্গাবাজ ডাকাতের দল আর সুরাবর্দির পুলিশকে দিয়ে চট্টলাকে ভারতের বাণিজ্যপথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শত্রুদেশের প্রভাব বলয়ে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্তেরই অংশ ছিল আমার পূর্বপুরুষদের হত্যা। আমরা ছিলাম দাবার বোড়ে মাত্র। তলোয়ারের ভয়ে সালোয়ার পরেছিলাম, কী লজ্জা, ছি ছি!

ভালো করে দেখুন, এটা শুধুমাত্র স্মৃতি নয়। এটা বহু দশক ধরে চলে আসা এক সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের প্রমাণ, যা আজও বহাল তবিয়তে রয়েছে। এই জামাত আসলে পুরনো মুখের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা নতুন মুখোশ মাত্র। ওরাই আমার পূর্বপুরুষদের খুন করেছিল, ওদের জন্যই আজ আমি মিথ্যে একটা পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছি, ওদের আমি ছাড়বো না।"

''আপনি এখন কী করতে চান?" বলল মায়া।

''আমার দাদাজী ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, পাকিস্তানিদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। চট্টলার দুঃখকষ্টের মূলে আছে নোয়াখালী। সেই ভুল আমি সংশোধন করতে চাই। যারা আমার পূর্বপুরুষদের হত্যা করেছিল, তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। সবচেয়ে বেশি যেটা চাই সেটা হলো, এই মিথ্যে পরিচয়ের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে চাই। নোয়াখালী থেকে শাহ্‌জালালাবাদের শাসন মুছে ফেলতে চাই। আপনারা কি আমাদের, মানে এক্স-মুসলিমদের সাহায্য করবেন? আমাদের দলে প্রায় হাজারখানেক স্বেচ্ছাসেবক আছে। অস্ত্রশত্রের জোগান পেলে আমরা নোয়াখালীতে বড়সড় গণ্ডগোল লাগিয়ে দিতে পারি। শত্রু এখন দুর্বল, এটাই সুযোগ।"

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল থুরা আর মায়া।

''চাইলেও আপনাদের সাহায্য করার মতো পরিস্থিতিতে আমরা নেই," বলল মায়া, ''এখান থেকে নোয়াখালীতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে গেলে পথেই সেসব ধরা পড়ে যাবে।"

''ভারতের ত্রিপুরা আপনাদের থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি," মাতঙ্গীর চোখে এক নতুন পরিকল্পনার ছায়া, ''আচ্ছা, একটু সময় দিন, আমি ভেবে দেখছি কী করা যায়। একটা কথা বলুন তো, আমি শুনেছি ভারতের নাগাদের খুব ভয় পায় জামাতিরা। এটা কি সত্যি?"

''একদম সত্যি," বলল রহিম, ''একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সিলেট সেক্টরে পাকিস্তানি বাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডকে অবরুদ্ধ করার যে নৃশংস কৌশল নাগারা নিয়েছিল, তা আজও লোকে ভোলেনি। ওরা অদৃশ্য থেকে জঙ্গলে যুদ্ধ করত, রাতে নিঃশব্দে বাঙ্কারে ঢুকে 'দা' দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের মাথা কেটে নিয়ে যেত। কবন্ধ বলে সে ধড় ইসলামি রীতিতে কবর দেওয়া যেত না, অনন্ত দোজখ নসীব হতো ওই পাকিস্তানিদের। জেহাদিরা মরতে ভয় পায় না, কিন্তু দোজখকে খুব ভয় পায়। সিলেটের যুদ্ধে নাগা রেজিমেন্টের ভয়ে পাকিস্তানিরা লড়াই ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেছিল। সেসব কথা আজ কিংবদন্তী হয়ে গেছে। এই জামাতিরা তো পাকিস্তানিদেরই বেজন্মা পোলাপান। পাকিস্তানিরা যাদের ভয় পায়, জামাতিরা তাদের ডবল ভয় পায়।"

''ঠিক আছি, দেখি কী করা যায়। রহিম সাহেব, আপনার মোবাইল নম্বরটা বলুন। আমি দরকার মতো আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

''আমি তাহলে এখন আসি," নম্বর দিয়ে তারপর হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিতে বলল রহিম, ''অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম। আপনাদের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় থাকবো।"



(চট্টলা, পূর্ব খোরাসান)

ভাঙা জানালার পাল্লার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল বোধিচিত্ত। ফাঁকা রাস্তায় কয়েকটা নেড়ি কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো জনমানুষের দেখা নেই। শীতের বাতাসে প্রেতের আঁশটে গন্ধ। রহিমের অবয়বটা দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পর একটা গলা খাঁকারি দিল বোধিচিত্ত।

মাতঙ্গী বলল, ''নাগাল্যান্ডের পেরেন জেলায় থাকে এমন একজনকে আমি চিনি, যে হয়তো সাহায্য করতে পারে। জঙ্গলের রাস্তায় পেরেন থেকে ডিমা হাসাও, সেখান থেকে জাম্পুই পাহাড় আর তৃষ্ণা অভয়ারণ্য হয়ে ফেনী নদীর চর পৌঁছতে কতদিন লাগবে? ঠিক জানি না। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। তুমি এই এক্স-মুসলিমদের এত বিশ্বাস করো কেন? কী করে বুঝছো, এরা ছদ্মবেশী নয়? হয়তো মোল্লাবাদীরাই এদেরকে এক্স-মুসলিম সাজিয়ে আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে — আমাদের খবর জানার জন্য, ভেতর থেকে লড়াইটাকে ভাঙার জন্য।"

মাথা নেড়ে বলল মায়া, ''আমি ওদের অন্ধভাবে বিশ্বাসও করি না, আবার পুরোপুরি বাদও দিতে চাই না। যেকোনো রাজনৈতিক বা আদর্শগত আন্দোলনে অনুপ্রবেশের ঝুঁকি থাকে। শুধু এক্স-মুসলিম কেন, আমাদের নিজেদের মধ্যেও তো থাকতে পারে। তাই প্রশ্নটা 'কে মুসলমান ছিল' নয়, প্রশ্নটা হলো — কে কতটা ধারাবাহিক, কতটা স্বচ্ছ, আর কঠিন সময়ে কোথায় দাঁড়ায়।"

''কিন্তু একজন মানুষ এক্স-মুসলিম হয় কেন?" প্রশ্ন থুরার, ''সবাই কি সত্যিই বিশ্বাস হারিয়ে বেরিয়ে আসে?"

''হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন," বলল মাতঙ্গী, ''আমি কর্মসূত্রে আবুধাবি আর দুবাইতে বড়ো একটা সময় কাটিয়েছি। সেখানকার স্থানীয় আরবদের কাছে ইসলাম ব্যক্তিগত উপাসনা পদ্ধতি, সেটা মানা আর না-মানা তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। সেটাকে আগ্রাসন আর টোটাল ডমিনেন্সের হাতিয়ার করে তোলেনি ওরা, এক্স-মুসলিমও হতে হয়নি ওদের। আমাদের এই উপমহাদেশে এত সমস্যা কেন?"

''এর একটা বড়ো কারণ খুবই সহজবোধ্য,'' বলল মায়া, ''ভারতে ইসলাম এসেছিল আগ্রাসনের মাধ্যমেই। এদেশে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ধরে রাখার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামি মোল্লবাদীরা সাধারণ মানুষকে জান্নাতের লোভ আর জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে বিশ্বাস ধরে রেখেছে। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে মানুষ প্রথমবারের মতো বিকল্প ব্যাখ্যা, ইতিহাস, সমালোচনা— সব একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছে। এখন শুধু 'পাপ হবে' বললেই মানুষ থেমে যাচ্ছে না।''

''এটা ঠিক বলেছো,'' বলল মাতঙ্গী, ''এই যুগে সেই মতবাদই টিকে থাকবে, যা মানুষকে বাস্তব জীবনে কিছু দিতে পারে —জ্ঞান, নৈতিকতা, স্বাধীনতা, উন্নতি, মর্যাদা, আধ্যাত্মিকতা। শুধু পরকালের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর সমাজকে ধরে রাখা যাবে না। ইসলামি মোল্লাবাদীরা সেখানেই সমস্যায় পড়েছে। ধরো, পূর্ব খোরাসানের সব মাদ্রাসা যদি আজ বন্ধ হয়ে যায় —আগামী প্রজন্মের কতজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই গোঁড়ামির পথ বেছে নেবে?''

''তুমি আসলে বলছো,'' একটু ভেবে বলল থুরা, ''বিশ্বাসের ভিত দুর্বল হয়ে গেছে। ইরানেও তো শুনেছি একই অবস্থা, নব্বই শতাংশ মসজিদে তালা পড়ে গেছে। লোকে প্রকাশ্যে নমাজ পড়তে ভয় পায়, পাচ্ছে লোকে মোল্লাবাদী ভাবে। ইরানের মতো গোঁড়া দেশে যখন এই হাল, তখন পৃথিবীর অন্যত্র কী হচ্ছে, তা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। রহিম সাহেব একটা কথা বললেন — 'মিথ্যে একটা পরিচয় বয়ে বেড়াচ্ছি', কথাটা খুব ভাবাচ্ছে। শুধুমাত্র ধর্মত্যাগী হওয়ার অপরাধে খুন হয়ে যাবে, এই ভয়ে অনেকে এখনো ঈমানে রয়েছে, কিন্তু তারাও একটু একটু করে সাহসী হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী, কেউ ভালোবেসে ইসলাম পালন করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই আগ্রাসী মনোভাব, এই জবরদস্তি বন্ধ হাওয়া দরকার। এই আগ্রাসন নিয়েই তো রাখাইনে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আমাদের সংঘাত বাধে।''

''শুধু তাই না,'' বলল মাতঙ্গী, ''এখানে আর একটা বিষয় কাজ করছে — 'ইউডেমনিক লেজিটিমেসি'। অর্থাৎ সাফল্য থেকে তৈরি হওয়া বৈধতা। ইতিহাসে বহু মানুষ কিছু মতবাদকে সত্য বলে মেনেছে শুধুমাত্র এইজন্য যে, সেটা যুদ্ধে জিতেছিল। এক সময় ইসলাম পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, যুদ্ধ জিতেছে, পরাক্রম দেখিয়েছে—সেটা থেকে অনেকে ভেবেছে, এদের পথই বুঝি সত্যের পথ। কিন্তু ইতিহাস তো স্থির নয়। এখন পৃথিবীর ক্ষমতার মানচিত্র বদলে গেছে। এখন নিদেনপক্ষে ভারতে তো দেখছি হিন্দুরা জিতছে। যে মধ্যপ্রাচ্য একসময় ইসলামের গৌরবের কেন্দ্র ছিল, সেখানে আজ নানা দেশ রাজনৈতিক ও সামরিক সংকটে জর্জরিত। ইরান আর তুর্কি সবচেয়ে গোঁড়া, ওরাই সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছে ইসলামি মোল্লাবাদীদের ঘোষিত চিরশত্রু ইহুদিদের হাতে। মানুষ দেখছে, শুধু ধর্মীয় পরিচয় সাফল্যের নিশ্চয়তা নয়। তখন যারা 'জয় মানেই সত্য' ভেবে ইসলামে এসেছিল, এখন তাদের বংশধরদের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে। সাফল্যের নতুন পথ খুঁজছে তারা। ইউডেমনিক লেজিটিমেসি একটা শাঁখের করাত, দুদিকেই কাটে। যারা সাফল্যের দ্বারা সৃষ্ট বৈধতা মেনে মুসলিম হয়েছিল, তারা এখন কী করবে?''

''ঠিক আছে,'' মাথা নেড়ে বলল থুরা, ''কিন্তু তবুও, এক্স-মুসলিমদের ওপর নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ। আজ তারা মোল্লাবাদের বিরুদ্ধে, কাল আবার ভয়ে বা চাপে ফিরে গেলে? বিশ্বাসঘাতকতা করলে?''



''সেই আশঙ্কা মোটেই অমূলক না,'' সম্মতি দিল মাতঙ্গী, ''আমাদের— মানে হিন্দু-বৌদ্ধদের মধ্যে ত্রিতাপের কন্সেপ্ট আছে। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। তেমনি শরীরে জীবাণু ঢুকলে অসুখ হয়, এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কিছু নেই। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ত্রিতাপের কন্সেপ্ট নেই। অন্তত আছে, এমনটা আমার জানা নেই। আজকের অধিকাংশ মুসলমান সমাজে অতিপ্রাকৃত নিয়ে ভয়, যেকোনো ঘটনাকেই গজব বা পরকালের শাস্তি ভাবা— এগুলোর শিকড় গভীরে। অনেকেই যুক্তি দিয়ে মজহব ছাড়লেও মানসিকভাবে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে না। জীবনে বিপদ এলেই— চাকরি গেল, পরিবারের কেউ অসুস্থ হলো, তখন মোল্লাবাদীরা সেটাকে 'আল্লার শাস্তি' বলে চাপ তৈরি করতে পারে। এই মানসিক দুর্বলতা একটা রূঢ় বাস্তব। তখন তাকে দিয়ে মোল্লাবাদী জামাতিরা যা খুশি করিয়ে নিতে পারে। তাই কাউকে শুধু 'এক্স-মুসলিম' পরিচয়ের কারণে বিশ্বাস করা বোকামি হবে। বিশ্বাস গড়ে ওঠে দীর্ঘ সময়ের আচরণ দিয়ে, পরিচয় দিয়ে নয়। সেইজন্যই আমার প্রশ্ন, এই রহিম সাহেবকে কি বিশ্বাস করা যায়? এই লোকটার ভরসায় কতটা ঝুঁকি আমরা নিতে পারি?''

''আমার ওপর বিশ্বাস রাখো,'' শান্ত স্বরে বলল মায়া, ''আমি অনেকদিন ধরে রহিম চৌধুরীর ওপর নজর রেখেছি। লোকটা সাচ্চা, বিশ্বাসী। লোকটার সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারি।''

''সে না হয় হলো,'' বলল থুরা, ''এই রহিম সাহেবকে আমারও সাচ্চা মনে হলো। কিন্তু আমি দেখেছি, এক্স-মুসলিমদের অনেকেই একটা রোম্যান্টিক ধারণার বশবর্তী হয়ে এক্স-মুসলিম হয়, তার পেছনে দীর্ঘদিনের মনন ও অভিজ্ঞতা থাকে না। এদের অনেকেই সব ধর্মকে অবজ্ঞা করে। হিন্দু, বৌদ্ধ — কাউকেই সম্মান করে না। এরা বলে সব ধর্মই কুসংস্কার, শুধু নাস্তিকতাই মুক্তি। এক্স-মুসলিমদের লড়াই তো মূলত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকারের জন্য। এরা শুরুই করে যেকোনো আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করে। এরা এক্স-মুসলিম হলেও অন্য সব ধর্মকে এরা ইসলামের দৃষ্টি দিয়েই দেখে। তাদের মধ্যে এরকম হামেশাই বলতে শোনা যায়, হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম হলো সবচেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মমত, ইসলাম তার থেকে ভালো, তবে নাস্তিকতা তার চেয়েও ভালো। আমরা আমাদের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আমাদের সভ্যতার অংশ মনে করি, এই অশ্রদ্ধা আমরা কীভাবে মেনে নেব? উদ্দেশ্যর এই বিরাট অমিল বড়ো ধরনের অবিশ্বাস তৈরি করেছে। ওদের সঙ্গে আমাদের আদর্শগত মিল কোথায়? একসঙ্গে কাজ করার জন্য ন্যূনতম কিছু অ্যালাইনমেন্ট তো চাই।''

''রাজনীতিতে সব জোট আদর্শগত মিল থেকে হয় না,'' বুঝিয়ে বলল মায়া, ''অনেক সময় নির্দিষ্ট বিপদের বিরুদ্ধে সীমিত সহযোগিতা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়ন একসঙ্গে লড়েছিল, নেতাজী দেশের স্বাধীনতার জন্য জার্মানির সাহায্য চেয়েছিলেন। শত্রুর শত্রু মিত্র।''

''মানে তুমি বলছো,'' বলল থুরা, ''স্থায়ী বন্ধুত্ব নয়, শুধুমাত্র কৌশলগত সহযোগিতা?''

''ঠিক তাই,'' নতুন উৎসাহে বলে উঠল মায়া, ''এক্স-মুসলিমরা ইসলামিক মোল্লবাদের বিরুদ্ধে। হিন্দু, বৌদ্ধ —এরকম অনেক গোষ্ঠীই ইসলামিক মোল্লাবাদের বিরোধী। তাই নির্দিষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত সহযোগিতা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। তবে শর্ত আছে—অন্ধ বিশ্বাস নয়, পারস্পরিক সীমারেখা পরিষ্কার রাখতে হবে। কেউ যেন নিজের মতবাদ অন্যের ওপর চাপিয়ে না দেয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকতে হবে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, জোটটা যেন শত্রুর প্রতি ঘৃণার ওপর না দাঁড়ায়, বরং স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকারের ওপর দাঁড়ায়। এক্স-মুসলিমরা ইসলামি সংস্কৃতি ও মজহবি কিতাব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে। মোল্লাবাদের তাত্ত্বিক দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে। অনেক এক্স-মুসলিম তাদের পরিবার, সমাজ এমনকী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে মজহব ত্যাগ করে। তাদের এই সাহসী অবস্থান প্রমাণ করে যে তারা মোল্লাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তরিক। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, জামাতিরাও ঠিক করে জানে না যে কে বিশ্বাসী মুসলিম আর কে এক্স-মুসলিম। ওদের এই অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ওদের হাঁড়ির খবর আমি নিয়মিত পাই।''

''তাহলে শেষ কথা কী?'' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল মাতঙ্গী।

''শেষ কথা হলো,'' শান্তস্বরে বলল মায়া, ''মানুষকে শুধু তার অতীত পরিচয় দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। এক্স-মুসলিমদের মধ্যে কেউ আন্তরিক, কেউ সুযোগসন্ধানী, কেউ বিভ্রান্ত —যেমন সব গোষ্ঠীতেই থাকে। কাজেই প্রশ্নটা 'ওরা কারা' নয়, প্রশ্নটা ওরা কী করছে, কেন করছে, আর সংকটের সময় কোথায় দাঁড়াচ্ছে, সেটা।''

''আমার হাতে আজ আর বেশি সময় নেই,'' বলল মাতঙ্গী, ''কিন্তু একটা গল্প যদি তোমাদের আজ না শোনাই তাহলে আর কখনো সুযোগ নাও হতে পারে। শুনবে?'

''নিশ্চয়ই,'' শিশুর মতো উৎসাহিত হয়ে উঠল মায়া, ''গল্প শুনতে আমি সবসময় একপায়ে খাড়া।''

''তাহলে শোনো,'' বলল মাতঙ্গী, ''হিন্দু পুরাণে বর্ণিত রক্তবীজ ছিল এক অসুর। সে এমন বর পেয়েছিল যে তার শরীর থেকে মাটিতে যত ফোঁটা রক্ত পড়বে, প্রতিটি ফোঁটা থেকে এক-একটি রক্তবীজ জন্ম নেবে। তাই মা দুর্গা তাকে যত আঘাত করেন, রক্তবীজের সংখ্যা ততই বেড়ে যায়। ফলে রক্তবীজকে পরাজিত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। তখন মা কালী আবির্ভূত হলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এমনভাবে রক্তবীজকে আঘাত করতে লাগলেন, যে তার রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই মা কালী তা পান করে নিতেন। ফলে নতুন রক্তবীজ আর জন্মাতে পারল না। শেষপর্যন্ত রক্তবীজের বিনাশ হলো।

এখানে 'রক্ত' আসলে আত্মপরিচয়ের রূপক। এ 'রক্ত' শারীরিক রক্ত নয়, এটা মানুষের গভীর পরিচয়বোধ — অহং বা 'আমি কে' এই ধারণা। রক্তবীজ শুধু এক অসুর নয়, সে মানুষের সেই প্রবণতা, যেখানে আহত পরিচয় নিজেকে বারবার পুনর্জন্ম দিতে থাকে। মা কালী এখানে 'কাল' বা সময়ের কসমিক শক্তি। তিনি এমন এক শক্তি, যিনি পরিচয়ের এই উন্মত্ত পুনরুৎপাদনকে পান করে সময়ের গহ্বরে হজম করে ফেলেন।

মা কালী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েই বুঝে ফেলেছিলেন, রক্তবীজরা মনে করে ওরা বিশিষ্ট, ওরা অন্যদের থেকে আলাদা। বিশিষ্টতার এই বোধটাই হলো রক্তবীজের প্রাণশক্তি। ওরা যে আলাদা, এই বিশ্বাসটাকে ওদের মন থেকে অপসারিত করতে হবে। তাহলেই রক্তবীজের ফিরে ফিরে আসা বন্ধ হবে।

রক্তবীজ আসলে এমন এক মানসিক বা সামাজিক শক্তির রূপক, যাকে সরাসরি দমন করতে গেলে সে আরও ছড়িয়ে পড়ে। যেমন কোনো গোঁড়া পরিচয়কে কেবল বলপ্রয়োগে দমন করলে তা আরও বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে। অপমান, প্রতিশোধ বা শহিদবোধ নতুন নতুন 'রক্তবীজ' তৈরি করে। একটিকে হত্যা করলে তার রক্ত থেকে আরও একটি জন্ম নেয় ; অর্থাৎ, পরিচয়ের ক্ষত থেকে নতুন উগ্র পরিচয় তৈরি হয়। এখানে মা কালীর রক্ত পান করার অর্থ — পরিচয়ের উৎসকে মুছে ফেলা, অহং ও বিভেদের শক্তিকে মাটিতে শিকড় গাড়তে না দেওয়া। অথবা এমন এক চেতনা তৈরি করা, যা সমুদ্রস্রোতের মতো এসে বিভেদকামী পরিচয়কে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই অহিতকামী পরিচয়ের বিস্তারকে নিজের ভেতরে ধারণ করে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যেমনটি শ্রীচৈতন্যদেব করেছিলেন। কথায় বলে, 'ভয়ে বা ভক্তিতে'। শ্রীচৈতন্যদেব যে কাজটা ভক্তি দিয়ে করেছিলেন, সেই কাজটাই সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রাণপুরুষরা ভয়কে ব্যবহার করে সম্ভব করেছিলেন। যার কাহিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে আছে। এখন প্রশ্ন হলো, মা কালী এই দুই পন্থার কোনটা ব্যবহার করেছিলেন? কী জানি, হয়তো দুটোই।"

''কিন্তু,'' ভুরু কুঁচকে বলে থুরা, ''এই নলেজটা আমরা এখন কীভাবে কাজে লাগাবো? আমাদের কি আরেকজন শ্রীচৈতন্যদেবের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে?"

মাথার ওপরে ঝুলে থাকা ভাঙা ঝাড়লণ্ঠনটা বাতাস ছাড়াই হঠাৎ দুলে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে দূর থেকে ভেসে এল একটা বুনো শেয়ালের ডাক — লম্বা, কাঁপা, মানুষের আর্তনাদের মতো। শব্দটা শুনে মনে হলো, পুরো ফিরিঙ্গিবাজার যেন এক মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। বাইরে কুকুরের ডাক থেমে গেছে, এমনকী বাতাসও যেন গলির ভেতর চলাচল বন্ধ করেছে। যেন আওয়াজটা শুনেই ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল মাতঙ্গী। বলল, ''রাত বাড়ছে, আমি চললাম। তোমরা আলোচনা চালিয়ে যেতে পারো, আমার আর সময় নেই। আগামী মাসখানেক আমাকে দেখতে পাবে না। আই উইল হ্যাভ কমপ্লিট রেডিয়ো সাইলেন্স। চিন্তা করো না, আমি ঠিক সময়ে ফিরে আসবো।"



পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে, যেখানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ভারতের সীমান্ত নেমে গেছে ঘন অরণ্যের ভেতর, সেখানে রাত খুব দ্রুত নামে। সন্ধ্যার পর পাহাড়ি পথগুলো যেন পৃথিবীর মানচিত্র থেকেই মুছে যায়। বাঁশঝাড়ের ফাঁকে বাতাস সাঁই সাঁই শব্দ তোলে, দূরে কোথাও বুনো শেয়ালের ডাক ভেসে আসে, আর মাঝে মাঝে সীমান্তের ওপার থেকে অস্পষ্ট গুলির আওয়াজ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

এই অঞ্চলেই গত কয়েক মাস ধরে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে এক উগ্র জামাতি জেহাদি । নাম তার মাওলানা কাশেম। একসময় মাদ্রাসার শিক্ষক ছিল। হজ করতে গিয়ে আফগান যুদ্ধফেরত কয়েকজন জেহাদির সংস্পর্শে এসেছিল, তখন থেকেই জেহাদি হওয়ার ভূত মাথায় চেপেছে। দেশে ফিরে দল পাকিয়েছে। পাহাড়ি বৌদ্ধ গ্রাম, চাকমা ও মারমা পরিবার, এমনকী স্থানীয় সুফি মুসলমানদের ওপরও হামলা চালাতে শুরু করেছে। রাতের অন্ধকারে মানুষ উধাও হয়ে যায়, পাহাড়ি মন্দিরে আগুন লাগে, আর গুজব ছড়িয়ে পড়ে — মাওলানার নাকি পোষা জ্বিন আছে, যারা জামাতিদের হয়ে কাজ করছে। ক্ষমতার ওপরতলার সঙ্গে প্রচুর যোগাযোগ আছে মাওলানা কাশেমের। পুলিশের লোকেরাও মাওলানার কথা শুনে চলে, বিভিন্ন বিষয়ে তার পরামর্শ নেয়।

এর পাশাপাশি আরেকটি গুজব আরও নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছিল। লোকেরা বলতে শুরু করেছে, পাহাড়ের গভীরে এক নারী বাস করে, যে মৃতদের ভাষা বোঝে। তার নাম মাতঙ্গী। বহুবার মাওলানা কাশেমের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এই নারী, প্রায় অলৌকিকভাবে।

সীমান্তঘেঁষা এক পরিত্যক্ত ব্রিটিশ বাংকারে বসে মাওলানা কাশেম তার অনুসারীদের নিয়ে পরিকল্পনা করছিল।

''এই পাহাড় শিরকের আস্তানা হয়ে গেছে,'' কাশেম বলছিল, ''বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, মাজারপূজারি —সবাইকে শেষ করতে হবে। সবচেয়ে আগে শেষ করতে হবে রাঙাপানির ওই কাফেরগুলোকে। নাফেজগুলা আমার চোখে চোখ রেখে কথা কয়, মালাউন হাইনরে এদ্দুর সাহস দেয় কনে?"

মাওলানার ডানহাত রশিদ নীচু গলায় বলল, ''হুজুর, এখন কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকাই ভালো। লোকে বলছে, এই জঙ্গলে নাকি এক ডাইনি এসেছে। সে জামাতি দেখলেই ঘাড় মটকে

রক্ত খায়। রাঙাপানির পথে যে শ্মশানটা পড়ে, সেখানেই নাকি মেয়েটাকে দেখা গেছে। আমি বলি কী, জিম্মি রাঙাপানি গ্রামটা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। গনিমতের মাল, পরেও লুঠ করা যাবে। এহন আর মারামারির ভিতরে ন গালানই গম ....”

কাশেমের চোখ জ্বলে উঠল, ‘‘ডাইনি না, ওটা ভারতের চর। আঁগিন বছর আগে ওটার নাম পুলিশের ফাইলে দেখেছিলাম। ও যদি সত্যিই ফিরে এসে থাকে, তাহলে আজই ওর শেষরাত। রাঙাপানি যাওয়ার পথে শ্মশানেই হুনু কাম্মান আগে সারি লই। আগে গনিমতের মাল হিসেবে ভোগ করব, তারপরে তোদের দিয়ে দেব। মেরে ফেলার আগে তরা যা খুশি কইরস মাগিটার সাথে।”

কাশেম জানত না, বাংকারের ঠিক ওপরে পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়ে তখন কেউ ওদের কথা শুনছে।

মাতঙ্গী।

চাঁদের আলোয় মুখটা অদ্ভুত ফ্যাকাশে লাগছিল। কপালে লাল সিঁদুরের প্রলেপ, গলায় রুদ্রাক্ষ আর মুণ্ডুমালা। ছোট্ট ছোট্ট আঙুলের কড়ের সাইজের খুলি দিয়ে তৈরি মালা —সাপের খুলি, পাখির খুলি, কুকুরের ভ্রূণের খুলি। মাঝে মানুষের আঙুলের হাড়। ভয়হীন চোখে এক শীতল হিসেবি দৃষ্টি, যেন এখনও গুপ্তচরবৃত্তির দিনগুলো ভুলে যায়নি। আস্তে করে মাটিতে হাত রাখল মাতঙ্গী, চোখ বন্ধ করল। মুহূর্তে চারপাশের বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

‘‘ওরা আসছে, তোরা তৈরি থাকিস! আজ তোদের ঋণ শোধের রাত।” ফিসফিস করে বলল মাতঙ্গী। ওর পিছনে ছায়ার মতো কিছু অবয়ব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। অর্ধস্বচ্ছ, কুয়াশার তৈরি মানুষের মতো আকৃতি। কারও শরীরে গুলির ক্ষত, কারও গলা কাটা।



নিঝুম রাতের অন্ধকারে মাতঙ্গী যখন শ্মশানের এক কোণে আসন পাতলো, চাঁদ তখনও ওঠেনি। চারদিক পাহাড়ের কালো অবয়ব। বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে পোড়া কাঠ আর পুরনো ছাইয়ের গন্ধ। কয়েকটা অর্ধদগ্ধ চিতার কাঠ এখনো নিভু নিভু জ্বলছে — লালচে আগুন মাঝে মাঝে হঠাৎ ফুস করে জ্বলে উঠছে, যেন অন্ধকারের বুক থেকে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে।

চারপাশে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতারও শব্দ আছে। দূরে পাহাড়ি ঝরনার ক্ষীণ কলকল, বাঁশঝাড়ে বাতাসের সরসর আওয়াজ, কোথাও অদৃশ্য কোনো রাতচরা পাখির কর্কশ ডাক। মাঝে মাঝে মনে হয়, কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল শুকনো পাতার উপর, কিন্তু তাকালে দেখা যায় কিছুই নেই।

শ্মশানের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বেঁকে যাওয়া শেওলাধরা বটগাছ। তাদের ঝুলে থাকা অগণিত শিকড় বাতাসে দুলছে, যেন অন্ধকারে কেউ ধীরে ধীরে হাত নাড়ছে। লোকমুখে শোনা যায়, রাত গভীর হলে ওই গাছগুলোর নীচে নাকি প্রেতেরা ভিড় জমায়। তারা নাকি গাছের চারপাশে বসে নিজেদের অপূর্ণ জীবনের কথা ফিসফিস করে বলে। পাহাড়ি কুয়াশার ভেতর দিয়ে সাদা ছায়ার মতো কিছু চলাফেরা করতে দেখা যায়—মানুষের মতো, অথচ মানুষ নয়।

হঠাৎ এক ঝাপটা ঠাণ্ডা বাতাস এল। চিতার ছাই উড়ে উঠে বাতাসে পাক খেল। বোঝা যায় না, সেটা বাতাসের খামখেয়ালিপনা, নাকি সত্যিই কোনো অদৃশ্য উপস্থিতি শ্মশানের অন্ধকারে জেগে উঠেছে। সদ্য জোগাড় করা জয়ন্তী গাছের শিকড় নিজের কবজিতে জড়িয়ে দেহবন্ধন করল মাতঙ্গী। গত রাতে মেরে ফেলা জামাতিটার মৃতদেহ আগে থেকেই নদীর জল ও পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করিয়ে কলাপাতায় মুড়ে রাখা ছিল। লাল সুতো দিয়ে হাত-পা বাঁধা, মুখ বন্ধ করা পোড়া মাছ দিয়ে। যত্ন করে তার চুল আঁচড়ে দেহে চন্দন লেপে দিল মাতঙ্গী। কপালে ও বাহুমূলে দিল চিতাভস্মের ছাই। সামনে ধুনির আগুন জ্বলছে, তার নীলচে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। আগুনে বেশ কিছুটা সাদা সর্ষে ঢেলে দিল, তারপর মৃতদেহকে প্রণাম করে শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে সাধনার অনুমতি নিল। অঙ্গন্যাস ও মন্ত্রের মাধ্যমে মৃতদেহকে পবিত্র আসনে রূপান্তরিত করল। শেষে মৃতদেহের বুকের ওপর পদ্মাসনে বসল।

চোখ বুজে কুকুরের মতো দ্রুতলয়ে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল মাতঙ্গী। শিরায় শিরায় জেগে উঠল আদিম শক্তির পাশবিক নিষ্ঠুরতা। শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠল, মনের মধ্যে উন্মাদ উদ্দীপনা। চারপাশের পৃথিবী হঠাৎ খুব দ্রুত চলতে শুরু করল। মনের মধ্যে অবদমিত সব আবেগ একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে বের হয়ে এল। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। মনে হলো ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, অতীত বলেও কিছু নেই। আছে শুধু এই মুহূর্তটি। মাংসপেশিতে তীব্র শক্তি, শিরায় শিরায় হিংস্র ক্ষিপ্রতা।

সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসের গতি কমতে শুরু করল, দীর্ঘায়িত হতে লাগলো, পাখির মতো দীর্ঘ ও ধীর নিঃশ্বাস। শরীর পালকের মতো হালকা, মনটা আকাশের মতো মুক্ত লাগতে শুরু করল। মনে হলো ও মাটির টান ছেড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ধুলোবালি আর ওকে স্পর্শ করতে পারছে না। চারপাশের জগৎটা খুব স্পষ্ট ও উজ্জ্বল মনে হতে লাগল। সব অবসাদ কেটে নতুন শক্তির সঞ্চার হলো। বাস্তবতা এখন আর কোনো খাঁচা নয়, ডানা মেলার এক বিশাল আকাশ। পৃথিবীটা একটা স্থির ক্যানভাস। অনেক বড়ো, সীমানাহীন। চারপাশের অবযবগুলো ধীরগতির লক্ষ্যবস্তু। প্রতিটা পিঁপড়ের চলাফেরা, প্রতিটা রাতচরা পাখির নড়াচড়া মাতঙ্গীর পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দিতে লাগল।

সেখান থেকে আরও ধীরে আরও দীর্ঘ নিঃশ্বাস — সাপের মতো। বাতাস বরফের মতো শীতল হয়ে এল। জঙ্গলের কোলাহল

আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। শুধু নিজের শ্বাসের 'হিস্' শব্দ স্পষ্ট, আর সবকিছু মুছে গেল। মনে হলো, পৃথিবীর আবর্তন-পরিক্রমণের গতি ধীর হয়ে যাচ্ছে। সময়ও বুঝি ধীর হতে হতে একসময় থমকে গেল। মনের ভেতর থেকে সব চিন্তা দূর হয়ে রয়ে গেল এক গভীর শূন্যতা। শরীর সম্পূর্ণ শিথিল। বুকের ভেতর হিমশীতল নীরবতা। মাতঙ্গীর মনে হলো, চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে ও মিশে গেছে। বোঝার উপায় নেই, ও জীবিত না মৃত।

সেখান থেকে আবার পাখি, তারপর কুকুর। ক্রমাগত এই চক্র চলতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর চোখ মেললো মাতঙ্গী। পকেট থেকে বের করল সিঁদুর মাখানো আয়নার টুকরো, জড়িবুটি আর ভস্ম, আগুনে নিক্ষেপ করল। সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসের গন্ধ বদলে গেল — এক তীব্র, কটু অথচ নেশা ধরানো সুগন্ধে ভরে উঠল চারপাশ। একরাশ ধুতরো ফুল সংগ্রহ করে পাশে রাখা ছিল। আর ছিল সাপের চর্বি থেকে তৈরি তেল, কাকের বাসার সরু কঞ্চি। উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটা করে ধুতরো ফুল, তার সঙ্গে সাপের তেলে ডুবিয়ে কাকের বাসার কঞ্চি আগুনে উৎসর্গ করতে লাগলো মাতঙ্গী।



পূর্ণিমার চাঁদ মাথার ওপর উঠলে কাশেম তার পঞ্চাশজন সশস্ত্র অনুগামী নিয়ে রাঙাপানি গ্রামের দিকে অগ্রসর হলো, হাতে চীনা রাইফেল। পাহাড়ি পথের মাঝখানে পৌঁছতেই অদ্ভুত কিছু ঘটনা শুরু হলো। প্রথমেই রশিদ খুঁতখুঁত করে উঠল, ''হুজুর, বাতাসত আতপ চাউলের গন্ধ আইল ক্যান গরি?'' এক ধমকে রশিদকে চুপ করিয়ে দিল কাশেম। আর প্রায় একশো পা চলার পরেই ওয়্যারলেস সেটগুলো বিকট শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। ধুতরো ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। রশিদ কাঁপা গলায় বলল কাশেমকে, ''হুজুর...ইঁন্ডে বেশি শীদ লাগের ....ডর লাগের ....''

কাশেম উত্তর দেওয়ার আগেই সামনের জঙ্গলে একটি শিশুর হাসি শোনা গেল।

খিলখিল।

তারপর আরেকটি।

তারপর শত শত।

জঙ্গলের অন্ধকারে হঠাৎ অসংখ্য ছোটো ছোটো চোখ জ্বলে উঠল।

জামাতিরা ভয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করল। হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠল, ''ওই দেখ! গাছে মানুষ ঝুলছে!''

টর্চের আলো ফেলে সবাই তাকিয়ে দেখল, গাছের ডাল থেকে ঝুলছে কয়েকটা পচাগলা মৃতদেহ। তাদের চোখ খোলা। আর সেই চোখগুলো একসঙ্গে তাকিয়ে আছে কাশেমের দিকে।

কাশেম বন্দুক তুলতেই ওর পিছনের তিনজন হঠাৎ মাটিতে উলটে পড়ে ছটফট করতে লাগল, গলা আঁচড়াতে লাগলো, যেন অদৃশ্য কেউ ওদের গলা টিপে ধরেছে।

''ওরে আল্লা রে ....'' আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল কাশেমের মুখ। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আয়াতুল কুরসি পড়তে আরম্ভ করল, ''... ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম....''

হঠাৎ কাশেমের মনে হলো, পায়ের তলার মাটিটা যেন জলার পাঁকের মতো নরম হয়ে যাচ্ছে। অনুচরদের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠল। ওরা কেউ আর সেখানে নেই। ওদের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু ওদের কঙ্কালসার প্রেতদেহ, জোড়া জোড়া চোখ দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত।

'ক্বুল আউযু বিরাব্বিন নাস....' গলার সব জোর দিয়ে চেঁচিয়ে দোয়া পড়ার চেষ্টা চালিয়ে গেল কাশেম, কিন্তু নিজের গলার স্বর ও নিজেই শুনতে পেল না। ঠিক তখনই কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মাতঙ্গী। ধীরগতিতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল কাশেমের দিকে। পায়ের নীচে শুকনো পাতা নয়, রাশি রাশি কালো ছাই উড়ছে।

''তুই?'' কাশেম ফিসফিস করল। মাতঙ্গী অট্টহাসি হেসে উঠল। কাশেম দেখল, শ্মশানের প্রতিটি গাছ এক-একটি অতিকায় সাপে রূপান্তরিত হয়ে ওকে গিলে খেতে আসছে। আগুনের ফুলকির মতো হাজার হাজার জ্বলন্ত পতঙ্গ গায়ে কামড় বসাচ্ছে। যেদিকেই তাকাচ্ছে, দেখছে মাতঙ্গীর শতশত প্রতিচ্ছবি ওকে ঘিরে অট্টহাসি হাসছে। কাশেমের চারপাশে তখন মৃতদের ফিসফিসানি।

''আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দে...''

''আমার মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে গেলি...''

''আগুনে কেন পোড়ালি...''

''আমাদের রক্তের হিসাব দে....''

কাশেম দেখল, চারপাশে চেনা মুখের জঙ্গল। আজ অব্দি যেসব মালাউনদের ও খুন করেছিল, তারা সবাই এগিয়ে আসছে। পোড়া মুখ, রক্তাক্ত চোখ, ছিন্ন অঙ্গ। দেখল, ওর সাগরেদ রশিদ ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। হাতের বন্দুকটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শূন্যচোখে মরা মাছের দৃষ্টি। ডুকরে কেঁদে উঠল কাশেম, ''রশিদ, চল, ফুডাই যাই!''

উত্তরে মুখটা হাঁ করল রশিদ। মুখগহ্বর থেকে একরাশ মাকড়শা কিলবিল করে বেরিয়ে এল।

প্রাণভয়ে দৌড়তে শুরু করল কাশেম। কিন্তু যতই দৌড়য়, দেখে যে ও বারবার একই জায়গায় ফিরে আসছে, সেই পুরনো শ্মশানের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে মাতঙ্গী শেষ মন্ত্রটি উচ্চারণ করল।

চারপাশের মৃত আত্মাগুলো ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরতে লাগল। জামাতিদের কেউ দেখল আকাশ ভেঙে পড়ছে, কেউ দেখল মাটি

ফুঁড়ে বেরোচ্ছে প্রেতাত্মাদের কঙ্কাল হাত। মানসিক ভারসাম্য ভেঙে পড়তে লাগল। কেউ নিজের সঙ্গীকেই গুলি করল, কেউ-বা পাহাড়ের খাদে ঝাঁপ দিল। হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল কাশেম।

''আমাকে বাঁচাও ... দয়া করো ... ''

''তোর দলবল যখন ফুলের মতো ছোট্ট শিশুদের আগুনে ফেলে দিচ্ছিল,'' ঠাণ্ডা গলায় বলল মাতঙ্গী, ওর চোখে বিন্দুমাত্র করুণা নেই, ''তখন কি তুই তাদের বাঁচিয়েছিলি? দয়া করেছিলি?''

পাহাড় কাঁপিয়ে এক বিকট আর্তনাদ শোনা গেল। তারপর সব শান্ত।

পরদিন সকালে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পাহাড়ি পথে শুধু পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র আর আতঙ্কিত কয়েকজন বেঁচে থাকা জামাতিকে খুঁজে পেল। সবাই বদ্ধ উন্মাদ, উলঙ্গ। কেউ আয়াতুল কুরসী বিড়বিড় করছিল, কেউ-বা নিজের চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছিল। মাওলানা কাশেমের কিন্তু কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। না জীবিত, না তার মৃতদেহ। মাতঙ্গী ততক্ষণে অনেক দূরে, পাহাড়ের কুয়াশা ভেদ করে সীমান্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।



বুনো বাঁশঝাড়ের ঘন অন্ধকার বুক চিরে তরতরিয়ে এগিয়ে চলল মাতঙ্গী। চারদিকের লতাবাঁশের ধারালো পাতাগুলো হাত-পায়ে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে, সেদিকে ওর বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বনের আরও গভীরে, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতে ভয় পায়, সেখানে প্রাচীন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে শতবর্ষী এক বুড়ো বৈলাম গাছ। আকাশছোঁয়া সেই দৈত্যাকার গাছের গোড়ার দিকে মাটির ওপর দেওয়ালের মতো ছড়িয়ে আছে বিশালাকার তক্তার মতো শিকড়, যা প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি করেছে এক অন্ধকার গোপন কুঠুরি। আর তাকে আরও নিশ্ছিদ্রভাবে আড়াল করে রেখেছে চারপাশের বুনো বাঁশের ঘন জঙ্গল।

মাতঙ্গী ক্ষিপ্র হাতে ওপরের ডালপালা আর লতাগুল্ম সরিয়ে ফেলল। বৈলাম গাছের সেই কোটরে, শুকনো পাতা আর জংলি লতার চাদরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জলপাই-সবুজ রঙের ইস্পাতের তৈরি দানব, একটা ভারী মিলিটারি মোটরবাইক। বাইকটার গায়ে জমে থাকা ধুলো আর শুকনো পাতা যত্ন করে ঝেড়ে ফেলে সেটার ওপর চড়ে বসল মাতঙ্গী। ভারী বুট দিয়ে কিকস্টার্টারে সজোরে লাথি মারল। একবার, দুবার, তৃতীয়বারে গর্জে উঠল বাইকের শক্তিশালী ইঞ্জিন। সেই গম্ভীর, গুরুগুরু আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল নিস্তব্ধ বাঁশঝাড়। ডালপালা থেকে হুড়মুড় করে উড়ে গেল একঝাঁক বাদুড়।

গিয়ার বদলে অ্যাক্সিলারেটরে মোচড় দিল মাতঙ্গী। হেডলাইটের তীব্র হলুদ আলো বনের জমাটবাঁধা অন্ধকারকে ফালাফালা করে দিল। শক্তিশালী চওড়া টায়ার দুটো মাটি কামড়ে শুকনো বাঁশ আর ডালপালা দুমড়ে-মুচড়ে সামনে এগিয়ে চলল। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা, অসমতল জংলি পথ ধরে ঝড়ের গতিতে ছুটল সে। ইঞ্জিনের গর্জন আর পেছনের চাকা থেকে ছিটকে ওঠা শুকনো ধুলোয় পাহাড়ি জঙ্গলকে আচ্ছন্ন করে মুহূর্তের মধ্যে বনের সবুজ গোলকধাঁধায় উধাও হয়ে গেল মাতঙ্গী।



(নাগাল্যান্ড, ভারত)

''শোন বাছা, তোকে বলি। চাঁদ যখন এই নদীর ঠিক ওপরে দেখা দেয়, ঠিক তখন ঘটনাটা ঘটে। গোল নিটোল পূর্ণিমার চাঁদ, একটুও জলের নীচে নেই, কিন্তু জলকে ছুঁয়ে আছে, সেই মুহূর্তে দিগন্তজুড়ে একশো ঢাক বেজে ওঠে। রাতের বাতাসে ভর করে রাতফুলের সুবাসের সঙ্গে সেই ঢাকের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে এই পূরবী পাহাড়ে। তুই জানিস, কে সেই ঢাক বাজায়? দোয়াং নদীর এই ভূতজুঁয়া দ্বীপ। যে তার অতীতকে এখনো ভোলেনি।''

দোয়াং নদীর শান্ত জলরাশির মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপটা যেন রূপকথার এক মায়াবী ভূখণ্ড। মাথার ওপর ভাঙা চাঁদ উঠেছে, গোটা দ্বীপ রুপালি চাদরে ঢাকা পড়েছে। নাগাল্যান্ডের উঁচু পাহাড়গুলোর ছায়া নদীর স্বচ্ছ আয়নার মতো জলে এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, দ্বীপটা আর স্থির নেই। এটা যেন এক ভাসমান স্বপ্নতরী, নদীর মিষ্টি জল কেটে উজানে এগিয়ে চলেছে।

''লোকে বলে,'' আবার বলে উঠল বুড়ো, ''সাতচল্লিশ সালে নাকি দেশ স্বাধীন হয়েছিল। কী জানি, আমাদের জন্য তো হলো উলটো। এদিকে ভারত, অন্যদিকে বার্মা, আমাদের এক জনগোষ্ঠী দুই স্বাধীন দেশের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে রয়ে গেল। শুধু কি তাই? বাঙ্গালিদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে —পেত্নির হাতে পুত্ সমর্পণ। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য সেই ব্যবস্থাই করলেন, যাতে এই পূর্বী পাহাড়গুলো খ্রিস্টান মিশনারিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠে। কেন? তাহলেই তো আমরা আমাদের অতীতকে ভুলে যাবো। আমাদের দাও আর বর্শা ফেলে দিয়ে ওদের গিটার আর ভিক্ষাপাত্র ধরব, খুশিমনে দাসত্ব স্বীকার করব।

তারপর যেন এক অভিশাপ নেমে এল আমাদের ওপর। আমাদের সভ্য করার নাম করে ধরেবেঁধে ইংরেজি শেখানো হল। বিদেশি গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে চাপা পড়ে গেল আমাদের জনজাতি ঢাকের আওয়াজ। আমাদের যুব প্রজন্ম 'যেযু যেযু' করে উন্মত্তের

মতো লাফালাফি করে রাতভর, চোখধাঁধানো আলো আর কানফাটানো বাজনার সঙ্গে। চাঁদনি রাতে এই জলজঙ্গল যে কত কথা বলে আমাদেরকে, সে তারা শুনবে কী করে? মিশনারিরা আসার আগে কেমন ছিলাম আমরা, সে কথা সবাই ভুলে গেল, ভুলল না শুধু এই ভূতজুঁয়া দ্বীপ। এই দ্বীপের শিকড় ছড়িয়ে আছে দোয়াং নদীর গভীরে। এ দ্বীপের নিঃশ্বাসের তালে জোয়ার-ভাঁটা হয় নদীর জলে।

সাদা পাদরিরা আসার আগে এই নাগা পাহাড়ের মানুষরা প্রকৃতির কোলে আরামে ঘুমোতো। চাঁদনি রাতে মাছ ধরত, তারার আলোয় চাষের খেতে বীজ ছড়াতো, গান গেয়ে এই নদীর দেবীকে, আকাশের দেবতাকে, এই পাহাড় এই জঙ্গল —প্রকৃতির শক্তিদের প্রতি তাদের অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত। সবার ওপরে আকাশজুড়ে ভেসে বেড়াতেন জন্মদাত্রী উকে-পেনু-ও-পফু। সৃষ্টির আদিতে তিনিই তো শুধু ছিলেন। পঞ্চভূত দিয়ে তিনিই তো গড়েছেন এই সবকিছু। আমরা তাঁরই সন্তান। আলাদা করে গির্জা গড়তে হতো না আমাদের, প্রকৃতির কোল ছিল আমাদের উপাসনাস্থল।

কিন্তু তারপর এল ওরা। পরনে সাদা আলখাল্লা, মনে জমাট অন্ধকার আর অনন্ত খিদে। হাতে তাদের লোহার ক্রশ আর আগুন বৃষ্টিকারী লোহার নল। ওরা নিয়ে এল এমন এক দেবতাকে, যে নিজেই কোনোদিন এই পাহাড় জঙ্গল নদী দেখেনি। নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে কিছুই দেখার ক্ষমতা ছিল না সেই সাদা লোকেদের। আর সেই সংকীর্ণতাই ওরা চাপিয়ে দিল আমাদের ওপর। ওরা এসে বলল, আমাদের দেবতারা নাকি মিথ্যে। আমাদের পবিত্র স্থানগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল, আমাদের ঢাকগুলো ফাটিয়ে দিল, থামিয়ে দিল আমাদের গান, আমাদের হাজার হাজার বছরের জীবনচর্যা। বাতাস ভারী হলো পোড়া ছাইয়ের গন্ধে, বন্দুকের গর্জনে স্তব্ধ হলো উকে-পেনু-ও-পফু দেবীর স্তবের প্রাচীন মন্ত্রোচ্চারণ।

আমাদের লোকেরা যারা তখনও তাদের প্রাচীন বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বেঁচে ছিল, সমাজে কোণঠাসা হয়ে পিছু হটতে হটতে তারা শেষমেশ এই ভূতজুঁয়া দ্বীপে এসে আশ্রয় নিল। সেখানেও তাদের শান্তিতে বাঁচতে দিল না পাদরিরা। নব্যমতের অনুরাগে অন্ধ নাগাদের সঙ্গে নিয়ে তারা নৌকো করে পার হলো নদী, আগুন ধরিয়ে দিল দ্বীপের জঙ্গলে।

সেটা ছিল এক পূর্ণিমার রাত। সেই রাতে আচমকা চাঁদ ঢেকে গেল মেঘে, আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামলো, নিভিয়ে দিল সব আগুন। মেঘের গর্জনে আমাদের জন্মদাত্রী উকে-পেনু-ও-পফু বললেন, নাগা পাহাড় জুড়ে যা করেছ তা সহ্য করেছি, আর নয়। এই ভূতজুঁয়া দ্বীপে তোমাদের কোনো অধিকার নেই। যে চেতনার জন্ম প্রকৃতির উন্মেষের সঙ্গে, তাকে তোমরা ভোলাবে কীকরে? দোয়াং নদীর ঢেউ যাকে মনে রেখেছে, তোমরা তাকে ভোলাবে কীকরে?

সেই রাতে দোয়াং নদীতে বান ডাকলো, ভাসিয়ে নিয়ে গেল দ্বীপ। জন্মদাত্রী হলেন অদৃশ্য। কেউ বলে, তিনি নদীর জলে বিলীন হয়েছেন। অন্যরা বলে, এই দ্বীপের শিকড় ধরে তিনি ফিরে গেছেন সৃষ্টির আদিমুহূর্তের সেই শূন্যতাতে। কিন্তু যাওয়ার আগে তিনি জাগিয়ে দিয়ে গেছেন এই দ্বীপের আত্মাকে। বলে গেছেন, যেদিন এই পাহাড়ের শিশুরা তাদের গান ভুলে যাবে, তুমি তখন গান করো, মনে করিয়ে দিও ওদেরকে।

তাই ভূতজুঁয়া দ্বীপ আজও গান গায়।

যে রাতে দোয়াং নদীর বন্যায় সব ভেসে গিয়েছিল, তারপর আরেকটা মাস কেটে গেল। আবার রুপোলি আলোয় আকাশ আলো করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। নাগা পাহাড় চমকে গেল, ভূতজুঁয়া দ্বীপ জুড়ে হাজার হাজার ঢাক বাজছে! কে বাজাচ্ছে ওই ঢাক? ভূতজুঁয়া দ্বীপে তো আর কোনো জীবন্ত মানুষ থাকে না! মানুষ নয়, ও ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে মাটির গভীর থেকে। তার তালে তালে দোয়াং নদীর জল উথাল-পাথাল নেচে উঠল। মনে হলো, যেন আকাশের সব তারা খসে পড়েছে দ্বীপে, জঙ্গলের আনাচেকানাচে অসংখ্য আলো জ্বলে উঠল। দূরে শহরের গির্জার ভেতর আশ্রয় নিল ভয়ার্ত নব্য-ধর্মান্তরিত নাগারা। পাদরি তাদের বলল, ওই ভূতজুঁয়া দ্বীপে কক্ষনো যেও না, ওখানে শয়তানের বাস।"

বুড়ো খংখাই দম নেওয়ার জন্য থামলো। পাথরের মগ থেকে এক ঢোঁক ঝরনার জল খেয়ে ''আহ্'' বলে তৃপ্তির একটা শব্দ করল।

''তারপর কেটে গেল কয়েকটা প্রজন্ম,'' আবার বলতে শুরু করল বুড়ো খংখাই। কপালে গভীর ভাঁজ, চোখদুটো শত বছরের নাগা ইতিহাসের সাক্ষী।

''শহর বেড়ে বেড়ে জঙ্গলের শরীর শুধু নয়, তার আত্মাকেও গ্রাস করে নিল। কিন্তু সে জঙ্গলকে ভুললো না দোয়াং নদীর ঢেউ।

কেথোর নাম তুই নিশ্চয়ই শুনেছিস। ও আঙ্গামী জনজাতির মেয়ে, লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল। চার্চ থেকে বৃত্তি পেয়ে আমেরিকা গিয়েছিল লেখাপড়া শিখতে। খুব ভালো গান গাইতো, গিটার বাজিয়ে। আমেরিকায় ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গানের অনুষ্ঠানে ওর ডাক পড়েছিল, নাগা গান শোনানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও গাইতে উঠেছিল। ওর গান শুনে মুখ ভেটকে ছিল শ্রোতারা। বলেছিল, এসব তো আমাদেরই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের নকল, তোমাদের নিজস্ব গান কই? বিরাট ধাক্কা লেগেছিল কেথোর মনে। বুঝেছিল, ওর নিজের গানেই পৃথিবীর কাছে ওর পরিচয়, কিন্তু সে পরিচয়, সে গান তো হারিয়ে গেছে।

লেখাপড়া সেরে ফিরে এসেছিল পাহাড়ে। কাজ করত মিশনারি স্কুলে। কিন্তু মনে মনে আসল নাগা গানের সন্ধান ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একদিন কী খেয়াল হলো ওর, চাকরিতে

ইস্তফা দিয়ে জঙ্গল ডিঙিয়ে নদী পার হয়ে পৌঁছে গেল ভূতজুঁয়া দ্বীপে। একা। শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়ে, জনজাতি গল্পকথায় বিশ্বাস ছিল না ওর। কিন্তু যে রাতে কেথো পৌঁছলো ভূতজুঁয়া দ্বীপে, সে রাতটা ছিল পূর্ণিমা। সে রাতে কেথো নিজের কানে শুনলো। হাজার হাজার ঢাকের বাদ্যিতে কথা কয়ে উঠলো ভূতজুঁয়া দ্বীপের মাটি, হাজার হাজার বছরের নাগা ইতিহাস সেই রাতে কেথোর কাছে সিনেমার দৃশ্যের মতো ধরা দিল।

সেই রাতটা বদলে দিল কেথোর জীবন। তারপর থেকেই কেথো পাগলের মতো উঠেপড়ে লাগলো ভূতজুঁয়া দ্বীপের গান নাগাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। বারবার হামলা হয়েছে ওর ওপর, গুলি লেগেছে গায়ে। কিন্তু জন্মদাত্রী বারবারই বাঁচিয়ে দিয়েছেন ওকে। কেথোর দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফল ফলতে শুরু করেছে এখন। নাগা সভ্যতার পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন জেগে উঠছে, সঙ্গে জেগে উঠছে নাগা জনগোষ্ঠীর আবার একসঙ্গে থাকার ইচ্ছে।"

"কিন্তু নাগা পাহাড় তো আজ আন্তর্জাতিক সীমারেখা দিয়ে বিভক্ত," বলল মাতঙ্গী।

"ঠিক এই কথাই হচ্ছিল আমার নাতি মেহুলের সঙ্গে," বলল খংখাই। "আমরা এখন চাই, মাঝখানের এই কাঁটাতাঁতের বেড়া সরিয়ে ফেলতে।"

"সেটা কীকরে হবে?" প্রশ্ন করল মাতঙ্গী।

"খুব সোজা," বলল খংখাই, "ভারতবর্ষ যতকাল অখণ্ড ছিল, ততকাল নাগা সমাজ বিনা বাধায় পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়েছে। আবার যদি অখণ্ড ভারতবর্ষ হয়, তাহলে আমাদের মধ্যেকার এই কৃত্রিম সীমান্ত মুছে যাবে।"

"হুঁ," বলল মাতঙ্গী, "বুঝলাম"।

"এবার তুই বল," বুড়ো আকুল স্বরে বলল, "ভারত কি তৈরি আছে, আমাদের সাহায্য করার জন্য?"

ভূতজুঁয়া দ্বীপের তীরের পাথরগুলো চাঁদের আলোয় হিরের মতো জ্বলজ্বল করছে। নদীর ছলাৎ ছলাৎ জল হালকা বাতাসে দুলতে দুলতে তীরের বালিতে আছড়ে পড়ছে, তৈরি করছে এক মৃদু ছন্দময় শব্দ, নির্জন রাতের প্রাণের সঙ্গীত। দ্বীপের বুকে জেগে থাকা দেবদারু আর পাইন গাছগুলোর সরু পাতা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো চুঁইয়ে নীচে পড়ছে, মাটির ওপর তৈরি করছে আলোছায়ার এক জটিল আলপনা। নাগা জনজাতির প্রাণের নিজস্ব আলপনা।

"কাজটা সহজ নয়," বলল মাতঙ্গী, "অনেক বছর লাগবে। কিন্তু আমি আপনাদের যথাযত সাহায্য করতে রাজি। পরিবর্তে আপনাদের একটা সাহায্য আমার চাই।"

দূরে পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে কোনো গ্রামের দু-একটি টিমটিমে আলো দেখা দিল, দেখে মনে হয় আকাশের তারা। এই দ্বীপে কিন্তু কেবলই নিস্তব্ধতার রাজত্ব। বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসে পাহাড়ের বুনো ফুলের এক হালকা মিষ্টি ঘ্রাণ আর নদীর আর্দ্র সতেজতা। মাঝে মাঝে কোনো রাতচরা পাখির ডানার শব্দ নদীর শান্ত বুক চিরে এক মুহূর্তের জন্য প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার মিলিয়ে যায়।

প্রকৃতির এই অপরূপ অকৃপণ সম্ভারে বুঁদ হয়ে মাতঙ্গী ভাবছিল, কী এক অসম্ভব প্রস্তাব রাখলো বুড়ো খংখাই। কোনো এক শহরের ক্যাফেতে বসে এই প্রস্তাব শুনলে ও হেসেই উড়িয়ে দিত। কিন্তু এই জল-জঙ্গলের মাঝে আজ রাতে কিছুই অসম্ভব মনে হচ্ছে না। আকাশ-পাতাল ভাবছিল মাতঙ্গী, ঠিক এই সময় ওর ফোনটা বেজে উঠল।

ফোনে কথা বলতে বলতে দেখছিল, নদীর স্রোত যখন দ্বীপের দুই পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তখন চাঁদের আলোর প্রতিফলন ঢেউয়ের গায়ে রুপালি সাপের মতো আঁ কিবুকি কাটছে। এই জ্যোৎস্না রাতে পাহাড়ের নিস্তব্ধতা আর দোয়াং নদীর শীতলতা মিলেমিশে দ্বীপটিকে এমন এক জায়গায় পরিণত করেছে, যেখানে সময় নিজেই যেন থমকে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, সবই সম্ভব। অখণ্ড ভারতও সম্ভব।

ভূতজুঁয়া দ্বীপ নাগভূমির অরণ্য-হৃদয়ের এক পলেস্তারা খসা প্রশান্তি। যে তার অতীতকে এখনো ভোলেনি। আজ সে নতুন কিছু চায়।



বৃষ্টি তো নয়, মনে হচ্ছিল যেন আকাশের ওপার থেকে কোনো এক অলৌকিক শক্তি অদৃশ্য সব মারণাস্ত্র ছুঁড়ছে। ডিমা হাসাও'য়ের বুকে এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। শুধু ডিমা হাসাও কেন, সারা পূর্বী পাহাড়েই বৃষ্টি হওয়াটা কোনো বড় ব্যাপার নয়, বরং মেঘ কেটে গিয়ে কড়া সূর্য উঠলেই লোকে সচকিত হয়ে আকাশের দিকে তাকায়। জলপাই রঙের মডিফাইড মহিন্দ্রা থার গাড়িটার ভেতরকার বাতাস ভেজা ক্যানভাস, সস্তা তামাক আর বন্দুকের তেলের কড়া গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছিল। মেহুল ওর দা-টা একটু সরিয়ে রাখল, বাঁশের হাতলটা পিতলের জাল দিয়ে মোড়া, ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ কলারবোনে এসে ঠেকছিল। মেহুলের চোখদুটো স্থির ছিল সামনের দুর্গম পথের ওপর। ঠিক পেছনেই, একটা তুবড়ে যাওয়া পুরনো উইলি জিপের ওপর গুটিসুটি মেরে বসেছিল আরও চারজন নাগা যোদ্ধা—ঝোপোলো, কেলেই, থেপফুভোলি এবং ভেখোসা। তুয়েনসাং-এর চেনা সবুজ পাহাড় ছেড়ে তারা বহু দূরে চলে এসেছে, এমন এক অচেনা ভূখণ্ডের দিকে যার সাধারণ মানুষজন জানেই না যে ওরা আসছে।

'ডিফ-লকটা অন কর, ঝোপোলো', গিয়ার বক্সের যান্ত্রিক আওয়াজ ভেদ করে নীচুস্বরে বলল মেহুল', এই খাদে যদি একবার



গাড়ি পিছলে পড়ে, তবে আমাদের পুরো অপারেশনটাই ভেস্তে যাবে। শিকারের আগেই অসমের কাদার গর্তে ডুবে মরলে গাঁওবুড়োর আর প্রেস্টিজ থাকবে না।'

''হাইওয়ে ধরলে এত সমস্যা হতো না,'' বেজার মুখে বলল ঝোপোলো।

''আকাশ থেকে হাইওয়ে দেখা যায়,'' বলল মেহুল, ''তার ওপর পথে চেকপোস্ট আছে। দশখানা গাড়ির কনভয়, রাস্তার অন্য গাড়িগুলো আমাদের দেখে সন্দেহ করতে পারে। খবর বাইরে যায়, এমন কোনো কিছু করলে চলবে না। জঙ্গলের পথ আকাশ থেকে দেখা যায় না, এখানে কোনো লোকজন নেই। এটাই ভালো।''

উত্তরে ঝোপোলো কিছু বলল না। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ওর আঙুলের গাঁটগুলো শক্ত হয়ে সাদা হয়ে আসছিল। নিঃশব্দে ছোটো সেকেন্ডারি গিয়ার লিভারটাকে টেনে ৪-লো মোডে ফেলল। লোহার শিকল জড়ানো চাকাগুলো জাম্পুই পাহাড়ের হাঁটু-সমান চটচটে লাল মাটি কামড়ে গোঙানির মতো শব্দ করে এগিয়ে চলল। একপাশে বাঁশঝাড়ে ঢাকা গভীর পাতাল-খাদ, অন্যপাশে ত্রিপুরার সীমান্ত অরণ্যের শ্বাসরোধকারী অন্ধকার গাছের ছাউনি। তিনটি রাজ্যের সীমান্ত পাহাড়ের চোরাপথ দিয়ে মেহুলের নেতৃত্বে দশখানা গাড়ি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল।

যাত্রার শেষ দিনের মাঝরাতে পাহাড়ি চড়াই-উতরাই হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। ডিমা হাসাও আর জাম্পুইয়ের খাড়া পাথুরে দেওয়ালগুলো হারিয়ে গেল দক্ষিণ ত্রিপুরার তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের জলমগ্ন, স্যাঁতসেঁতে নিচু সমতলে। চারপাশের বাতাস রাতারাতি বদলে গেল। সমুদ্রের লোনা ছোঁয়া আর পচা জলাভূমির গন্ধ বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে দিল ঝোপোলো। কুয়াশা আর মেঘের ফাঁক গলে নেমে আসা ম্লান চাঁদের আলো ভরসা করে পাহাড়ি নদীর কর্দমাক্ত খাত ধরে এগোতে লাগল। দুই পাশের হাতিঘাসগুলো এত লম্বা, যে সেগুলো গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে এসে নখের মতো আঁচড় কাটছিল।

'গাড়ি থামা, ঝোপোলো!' হাত তুলে ইশারা করল মেহুল। হাতিঘাসের আড়ালে দাঁড়িয়ে থার গাড়িটার ইঞ্জিন অলসভাবে চলতে লাগল, উঁচু এক্সহস্ট পাইপ দিয়ে জলের নীচে ক্রমাগত বুড়বুড়ি কেটে। সামনের ঘন কুয়াশা ফুঁড়ে জঙ্গলটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। ঠিক সামনেই শুয়ে আছে এক বিশাল, কালো আয়নার মতো বয়ে চলা জলধারা — ফেনী নদী।

নদীর কালো জলের ওপারে নোয়াখালীর বিস্তৃত সমতলভূমি। কুয়াশার চাদর ভেদ করে দূরের বিএসএফ আউটপোস্ট থেকে সার্চলাইটের তীব্র সাদা আলো কাদার চরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পূর্বপরিকল্পনা মাফিক, সার্চলাইটের আলোটা আকাশের দিকে তাক করে দু'বার কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই আলোর উৎস নদী থেকে সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঘুরে গেল, বনের ভেতরের গভীর খাঁড়িটি ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেল।

ঠিক তখনই ওপার থেকে, পূর্ব খোরাসানের সীমানার ভেতরের নলখাগড়ার বন থেকে একটা সবুজ পেনলাইটের আলো তিনবার ছোটো ছোটো ঝলকানি দিয়ে উঠল।

খোলা জিপের ওপর উঠে দাঁড়াল মেহুল, বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ভেজা হাওয়ার ঝাপটা মুখে এসে লাগল। দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল মেহুল। আমাদের সমুদ্র!

গাড়ির মেঝে থেকে একটা জলনিরোধক ভারী বাক্স টেনে তুলল ঝোপোলো, যার ভেতর রয়েছে ভারতীয় অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির তৈরি অস্ত্রশস্ত্র, ডিটোনেটর আর সুরক্ষিত স্যাটেলাইট যোগাযোগের সরঞ্জাম। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির তৈরি, কিন্তু তার গায়ে ছাপ লিথুয়ানিয়ার একটা কোম্পানির।

'থেপফুভোলি, ভেখোসা, পেছনের গাড়িগুলো থেকে বাক্সগুলো নামাও!' নির্দেশ দিল মেহুল, ''জোয়ারের কারণে নদীতে জল বাড়ছে। দেরি করলে চলবে না। আমরা হেঁটেই পার হব।''

জিপের ভারী দরজাগুলো ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলে গেল। দশ ডজন শিকারি বুটজুতো দেবে গেল নদীর কালো কাদায়। পাহাড়ি

কুয়াশার ভূতের মতো নিঃশব্দে মেহুল আর ওর দলবল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পা বাড়াল ফেনী নদীর সেই অন্ধকার বিতর্কিত জলে, যার কাদায় মিশে আছে নোয়াখালীর দাঙ্গার বলি হাজারো হিন্দুর রক্ত আর অশ্রু।

ফেনী নদীর বুক সমান লোনা জল কেটে ওপারে পা রাখতেই মেহুল অনুভব করল, মাটির চরিত্র বদলে গেছে। নোয়াখালীর এই কর্দমাক্ত চর পাহাড়ের মতো শক্ত নয়, বরং বিশ্বাসঘাতক চোরাবালির মতো পা টেনে ধরে। থেপফুভোলি আর ভেখোসা ভারী অস্ত্রের কাঠের বাক্সগুলো কাঁধে নিয়ে পাড়ের নলখাগড়ার বনে এসে ধড়াম করে সেগুলোকে মাটিতে আছড়ে ফেলল।

''আস্তে, আস্তে,'' বলল মেহুল।

ওপার থেকে সংকেত পাঠানো সবুজ পেনলাইটের মালিক রহিম এগিয়ে এল।

''দেরি হয়ে গেল, ভাই!'' রহিমের গলায় স্পষ্ট আতঙ্ক। ''বিজিবি, মানে বর্ডার গার্ডের একটা স্পিডবোট একটু আগেই এই চরে টহল দিয়ে গেছে। ওরা আবার ফিরতে পারে।''

মেহুল কোনো কথা না বলে পেছন ফিরে তাকাল। নদীর ওপারে ভারতের সীমানায় সারবেঁধে ওদের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ঝোপোলো আর কেলেই গাড়িগুলোকে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে তার ওপর গাছের ডালপালা এমন করে সাজিয়ে রেখেছে যে, অন্ধকার জঙ্গলে গাড়িগুলো পুরোপুরি লুকিয়ে পড়েছে। ঠিক তখনই, নলখাগড়ার বনের নিস্তব্ধতা চিরে দূর থেকে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এল। ফেনী নদীর কালো জল কেটে তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে একটা হালকা মোটরচালিত স্পিডবোট। তার সার্চলাইটের হলুদ আলো চরের অন্ধকারকে ফালাফালা করে দিচ্ছে।

''বর্ডার গার্ড!'' রহিম ফিসফিসিয়ে বলল, হাত কাঁপছিল ওর, ''ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে!''

''পজিশন নাও!'' মেহুলের শান্ত গলা নাগা যোদ্ধাদের মধ্যে বিদ্যুতের মতো কাজ করল। মুহূর্তের মধ্যে থেপফুভোলি আর ভেখোসা কাদার মধ্যে শুয়ে পড়ল, হাতে উদ্যত ধনুক, তিরগুলোর মুখ সোজা তাক করা স্পিডবোটের দিকে। স্পিডবোটটা চরের ঠিক কুড়ি গজ দূরে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করল। সার্চলাইটের আলোটা সরাসরি এসে পড়ল মেহুলের মুখের ওপর।

''ওখানে কে? হাত ওপরে তোলো!'' ওপার থেকে বাংলায় ভারী গলার হুঙ্কার ভেসে এল। দুজন বিজিবি জওয়ান বোটের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের চৈনিক রাইফেল মেহুলের দিকে তাক করল। মেহুল ওর হাত দুটো আস্তে আস্তে ওপরে তুলল। ডান হাতটা বুকের কাছে নিয়ে ওর এনক্রিপ্টেড স্যাটেলাইট রেডিয়োতে বর্ডার গার্ড চ্যানেলে খুব ধীরস্থিরভাবে বাংলায় উত্তর দিল, ''চোরাকারবারি নই। আমি আপনাদের জোন কমান্ডারের পরিচিত।''

বোটের ওপর থাকা গার্ডরা কিছুটা থমকে গেল। একে তো উত্তর আসছে ওদেরই রেডিয়ো চ্যানেলে, তার ওপর মেহুলের গলার স্বর এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে বর্ডার গার্ডদের আঙুল রাইফেলের ট্রিগার থেকে কিছুটা আলগা হয়ে এল। কয়েক সেকেন্ডের এক তীব্র, শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতা। বাতাসে শুধু ফেনী নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। নাগা যোদ্ধাদের আঙুল তখনও ধনুকের ছিলায় স্থির, মেহুলের একটা চোখের ইশারায় বিজিবির জওয়ানদের ঝাঁঝরা করে দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত। জওয়ানটি বোটে ফিরে গিয়ে তার ওয়্যারলেস সেটে কিছু একটা কোড বলল। ওপার থেকে কী উত্তর এল জানা গেল না, তবে তার পরেই সার্চলাইটের তীব্র আলোটা মেহুলের মুখ থেকে সরিয়ে নদীর জলের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো।

''পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই চর ফাঁকা হয়ে যাওয়া চাই,'' বোটের চালক জওয়ানটি শীতল গলায় বলল। পরক্ষণেই স্পিডবোটের ইঞ্জিন আবার গর্জে উঠল এবং মেহুলদের গ্রেফতার না করেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মেহুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত নামাল। দিল্লির অদৃশ্য হাত যে এত দূর পর্যন্ত কাজ করবে, তা ও ভাবেনি।

''আমাদের সময় কম,'' রহিমের দিকে তাকিয়ে মেহুল বলল। ''তোমার লোকেদের বলো, বাক্সগুলো তুলতে।''

''এখান থেকে আপনাদের নিজেদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নেবেন না?'' অবাক হল রহিম।

''গাওঁবুড়া বলে দিয়েছে,'' হেসে বলল মেহুল, ''এটা যুদ্ধ নয়, শিকার। শিকারে আজও আমরা দা আর বর্শা ব্যবহার করি। আজ রাতে আমরা কেউ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করব না।''

''ওদের জানিয়ে দিতে হবে,'' এতক্ষণ পরে মুখ খুলল ঝোপোলো, ''নাগাদের বন্দুক দরকার হয় না। যে বর্শা আর দাও নাগাদের ঘরে-ঘরে থাকে, ওদের জব্দ করতে সেসবই যথেষ্ট। আজ রাতের পর ওরা আমাদের পাহাড়ের দিকে আড়চোখে তাকানোর আগেও দুবার ঢোক গিলবে।''



(নোয়াখালী, পূর্ব খোরাসান)

সারাদিন ভিক্ষে করে অন্যদিনের তুলনায় কয়েকটা পয়সা বেশিই পেয়েছিল সুলতান। মনে আনন্দ, অনেকদিন পরে আজ হয়তো একটু মাছ জুটবে কপালে। কিন্তু সে টাকা থেকেও বখরা দিতে হলো রক্ষীদের। মনে মনে একটা খুব খারাপ গালাগাল দিল সুলতান। এরা ভিখিরির পয়সাতেও ভাগ বসায়!

যে কটা পয়সা বাকি ছিল, তাই দিয়ে আলির হোটেল থেকে পান্তাভাত আর খেসারির ডাল কিনে রাতের খাওয়া সারলো

সুলতান। হোটেলে ঢুকেই মরিচ শুঁটকির ভর্তার গন্ধ পেয়েছিল সুলতান। ভেবেছিল, একটু ভর্তা জুটবে। কিন্তু আলির বোধহয় আজ মনমেজাজ খারাপ, ফাউ কিছু কপালে জুটলো না সুলতানের।

নোয়াখালী জামে মসজিদের সামনের বাজারটাই হলো সুলতানের স্থায়ী ঠিকানা। আর পাঁচটা রাতের মতোই সেদিন রাতেও খোলা নর্দমার একপাশে জড়ো করে রাখা খড়ের গাদার ওপর ছেঁড়া চট বিছিয়ে শুয়ে ছিল ও। গ্রাম থেকে যখন প্রথম এখানে এসে ডেরা বেঁধেছিল, নর্দমার দুর্গন্ধ কষ্ট দিত। ঘুম আসতো না। এখন সবই গা-সওয়া হয়ে গেছে। আজব জায়গা এই বাজারটা। পচা শাকসবজি, মাছের আঁশ আর প্লাস্টিক বর্জ্য সবাই মিলে ড্রেন আটকে দিয়ে এক ধরনের উৎকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি করেছে। একটু বৃষ্টি হলেই পুরো এলাকা হাঁটু-সমান কাদা আর উপচে পড়া ময়লা নোংরা জলে একাকার হয়ে যায়। এরই মধ্যে সরু রাস্তার ওপর যত্রতত্র অটোরিকশা, ভ্যান আর হকারদের দখল, হাঁটাচলার জায়গা নেই। মানুষের চিৎকার আর যানবাহনের হর্নের শব্দে কান কালা হয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে থাকা অস্থায়ী দোকানগুলো কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই গড়ে উঠেছে, এমন ঘিঞ্জি জায়গা সুলতান বাপের জন্মে দেখেনি।

ছেঁড়া চটটা গায়ে টেনে যখন একটু চোখের পাতা এক করতে যাচ্ছিল, তখনই সেই আওয়াজটা কানে এল। নোয়াখালীর এই ভুতুড়ে শহরে রাতের বেলা শুধু মজহবি রক্ষীবাহিনীর বুটের শব্দ আর সামরিক ভ্যানের ভোঁ ভোঁ সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া যায়।

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

কিন্তু আজকের শব্দটা আলাদা। একটা চাপা থরথর কম্পন, যেন মাটি ফুঁড়ে কোনো আদিম দানব জেগে উঠছে। ল্যাম্পপোস্টের মিটমিটে আলোয় দেখল, অন্ধকারের বুক চিরে একদল ছায়া এগিয়ে আসছে। ওরা যখন পাশ দিয়ে গেল, গায়ের গন্ধে বুনো পাহাড়ের একটা কড়া গন্ধ পেল সুলতান। রাস্তার ধারের ঘোলাটে আলোয় দেখল, লোকগুলোর গায়ে ধনেশ পাখি আঁকা লাল-কালো শাল। হাতে তির-ধনুক, লম্বা দা। সুলতান লোকমুখে শুনেছে, নাগারা এই বিশেষ ধরনের অতিকায় বাঁকানো দা ব্যবহার করে। হায় আল্লা, এরা সব নাগা! নাগাদের সম্বন্ধে অনেক ভয়ঙ্কর গল্প শুনেছে সুলতান। ভয়ে কুঁকড়ে ছেঁড়া চটের টুকরোটাকে দিয়ে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল, ওরা সুলতানকে উপেক্ষা করে সরাসরি রক্ষীবাহিনীর চেকপোস্টের দিকে এগোচ্ছে। সুলতান দেখল, ওদের একজনের পিঠে বিশাল এক মহিষের চামড়ার ঢাল, হাতে লম্বা বর্শা। এই যুগে এমন সব অস্ত্রশস্ত্র! একবার ভাবল, হয়তো কোনো নাটক হচ্ছে। কিন্তু ভুল ভাঙল পরমুহূর্তেই। রক্ষীবাহিনীর জিপটা এগিয়ে আসতেই চারদিক থেকে শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ হলো। নাগা যোদ্ধারা বাতাসের মতো ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনো গুলি চলল না, শুধু একটা করে চাপা ধাতব 'খ্যাঁচ্' শব্দ আর রক্ষীদের আর্তনাদ।

তারপরেই দেখল, রাস্তার ধারের নর্দমা আর ঝোপঝাপ থেকে ছায়ার মতো একদল নাগা উঠে এল। তাদের হাতে কোনো বন্দুক নেই, আছে শুধু রক্তপিপাসু নাগা দা। অন্ধকারে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ছিল রক্ষীবাহিনী। বেশিরভাগ বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে, ঠিক তখনই একজন নাগা যোদ্ধা বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে এক রক্ষীর ঘাড়ে দা বসিয়ে দিল। এক কোপেই মাথাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল। রাস্তার ওপাশে দেখল আরেকদল নাগা যোদ্ধা অদ্ভুত এক রণহুঙ্কার দিচ্ছে, সঙ্গে ওদের হাতের ভারী বর্শাগুলোকে মাটিতে ঠুকছে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে রক্ষীরা যখন পালানোর চেষ্টা করল, তখনই ওরা পা দিল নাগাদের পাতা ফাঁদে। মাটির নীচে পুঁতে রাখা তীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাঁশের কীলকগুলো রক্ষীদের বুট ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নাগারা।

ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সুলতান। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখল ভোর হচ্ছে। রক্ষীদের কাটা মাথাগুলো বর্শার আগায় গেঁথে উন্মত্তের মতো নাচছে নাগারা। 'জয় দুর্গা নাগা' , 'জয় দুর্গা নাগা' মুহুর্মুহু হুঙ্কারে আবার মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হলো সুলতানের, রক্তের গন্ধে বমি ঠেলে উঠলো। দেখল, জামাতি একনায়কতন্ত্রের সুশিক্ষিত সেনারা এই আদিম নৃশংসতা দেখে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। যে ড্রেন দিয়ে রোজ নোয়াখালীর নোংরা জল বয়, আজ সেই ড্রেন দিয়ে রক্ষীদের রক্ত বইছে। রক্তস্নাত ভোরে যখন কুয়াশা কিছুটা পাতলা হয়ে এল, প্রথমবারের মতো খুব কাছ থেকে যোদ্ধাদের অবয়ব দেখার সুযোগ পেল সুলতান। শরীর জুড়ে নীলচে-কালো

রঙের অদ্ভুত সব উল্কি, যেন কোনো প্রাচীন আত্মার জীবন্ত রূপ। বিশেষ করে দলপতির বুকে আর গলায় বিশাল এক জ্যামিতিক নকশা। দলপতির চোখে চশমা দেখে অবাক হলো সুলতান। এরা তাহলে জংলি নয়, শিক্ষিত?

মাথায় বাঁশ ও বেতের তৈরি মুকুট, তাতে সগর্বে গোঁজা ধনেশ পাখির সাদা-কালো পালক। বাতাসের সঙ্গে সেই পালকগুলো দুলছিল, মনে হচ্ছিল অরণ্যের আত্মা মাথা নেড়ে ওদের উৎসাহ দিচ্ছে। কানে বাঘের নখ আর বুনো শুয়োরের দাঁতের তৈরি দুল, গলায় ঝোলানো পেতলের তৈরি ছোটো ছোটো মানুষের মাথার খুলির মালা। 'জয় দুর্গা নাগা' হুঙ্কারে আকাশ বিদীর্ণ করে নাগা যোদ্ধারা যখন ফেনীর চরের দিকে ফিরে যাচ্ছিল, ওদের পিঠের ওপর আঁকা সর্পিল উল্কিগুলো দেখে মনে হলো, ওরা সাধারণ কোনো মানুষ নয়, পাহাড় আর প্রকৃতির আদিম ক্রোধ, যা নোয়াখালীর এই পরাধীন জনপদে মুক্তির আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল। দিগন্ত জুড়ে তখন দাউদাউ আগুন জ্বলছে। বন্দুক হাতে একদল লোক সরকারি ভবনগুলো লুঠ করছে। যত্রতত্র বোমা ফাটছে।



(চট্টলা, পূর্ব খোরাসান)

বিদ্রোহের আগুন প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড়ের মঠ থেকে ব-দ্বীপের মৎস্যজীবী গ্রাম — সব জায়গা থেকে একজোট হয়েছে মানুষ। কৃষক, শিক্ষক, ছাত্র, বৌদ্ধ ভিক্ষু। যা শুরু হয়েছিল ফিসফাস থেকে, আজ তা এক সেনাবাহিনীর রূপ নিয়েছে, যাদের কোনো উর্দি নেই, নেই কোনো পতাকা। পথেঘাটে তারাই আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এখনও চট্টলা শহর আগলে বসে আছে। শোনা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই রাজধানী শাহ্‌জালালাবাদ থেকে বিশাল এক সেনাবাহিনী এসে পৌঁছবে, বিদ্রোহীদের সমূলে বিনাশ করতে। কিন্তু তারা কবে এসে পৌঁছবে, কেউ জানে না। মধ্যপ্রাচ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে, মরণপণ যুদ্ধে মেতেছে তুর্কি ও ইজরায়েল। সেই যুদ্ধে তুর্কিদের সাহায্য করতে গেছে পূর্ব খোরাসানের মিলিটারি। খলিফার দেশ তুর্কিকে সাহায্য করবে না পূর্ব খোরাসান, তা কি হয়?

বৈশাখী ভোরের কাঁচা রোদ তখনো বন্দরের বিশাল ক্রেনগুলোর মাথা ছাড়ায়নি। কুয়াশা আর ধোঁয়া মেশানো বাতাসে চড়া লোনা গন্ধ। নদীর ওপার থেকে একটা সাম্পান ঢেউ কেটে এপারে আসছিল, তার বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভোরের নীরবতায় দোলা দিচ্ছিল। দূরে একটা বিশাল বিদেশি জাহাজ তীব্র আওয়াজে সাইরেন বাজিয়ে সুর কেটে দিল।

চট্টলায় পূর্ব খোরাসান নৌবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি হলো বিএনএস ঈসা খান, কর্ণফুলীর তীরে। নৌবাহিনীর নৌবহর ও প্রশিক্ষণের প্রধান কেন্দ্রও এটাই। গতকাল রাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বিএনএস ঈসা খানের পতন হয়েছে। দুর্ঘটনা নাকি অন্তর্ঘাত, সেটা কেউ জানে না। চারদিকে এখন শুধু পোড়া গন্ধ আর ধ্বংসস্তূপ। রাতের সেই আগুনের লেলিহান শিখা এখন কালচে ধোঁয়ার রূপ নিয়েছে, বাতাসের সাথে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। আকাশ কালো হয়ে রয়েছে, চিল-শকুনও কাছে ঘেঁষছে না। জেটির মূল কাঠামোটা ভেঙে ঝুলে পড়েছে লোনা জলের ওপর। যে বিশালাকার যুদ্ধজাহাজগুলো গতকালও আধিপত্যের প্রতীক ছিল, সেগুলো এখন আধো-ডুবন্ত অবস্থায় কাত হয়ে আছে। তাদের স্টিলের শরীরে বিশাল গর্তগুলো দিয়ে এখনো হিসহিস করে বাষ্প বেরোচ্ছে। একসময় যেখানে বুটের শব্দ আর সাইরেনের আওয়াজে কান পাতা যেত না, সেখানে এখন এক গা-ছমছমে নীরবতা। কন্ট্রোল টাওয়ারের কাচগুলো গুঁড়িয়ে গিয়ে চকমক করছে মেঝেতে। বাতাসের ধাক্কায় আধখোলা একটা লোহার দরজা একঘেয়ে শব্দে বারবার আছড়ে পড়ছে দেওয়ালে। নৌঘাঁটির প্রধান ফটকের ওপর থেকে সরকারি পতাকাটা নীচে পড়ে আছে, চাকার দাগ আর ধুলোয় মাখা। কিছু হতবিহ্বল সৈন্যকে দেখা যাচ্ছে ধ্বংসস্তূপের মাঝে বেঁচে যাওয়া সরঞ্জাম হাতড়াতে। তাদের চেহারায় দম্ভের বদলে এখন ক্লান্তি আর পরাজয়ের আতঙ্ক। সমুদ্রের শান্ত নীল জলে কুচকুচে কালো তেলের আস্তরণ।

ঈসা খানের পতন বিদ্রোহীদের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে উপস্থিত হয়েছে। এটাই সঠিক সময়, চট্টলা থেকে শাহ্‌জালালাবাদের শাসনকে মূল থেকে উপড়ে ফেলার। ঈসা খান বিপর্যস্ত, কিন্তু চট্টলা শহর আজও অধরা। সেখানে চারিদিকে ইস্পাতের মিনার আর নজরদারি টাওয়ারের গোলকধাঁধা। প্রোপাগান্ডা স্ক্রিনের পাহারায় সেখানে দিন-রাত শুধু আনুগত্যের গান বাজে। শহর দখল করতে হলে শহরকে ঘিরে ফেলা দরকার। সাগর আর নদীকে দরকার। মায়া উত্তর তীরের বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে পরিকল্পনার শেষ প্রস্তুতি দেখছিল। ব্যারাখতার ড্রোনের নতুন কোনো চালান তুর্কি থেকে এসে পৌঁছয়নি, এসে পৌঁছনোর সম্ভাবনাও ক্ষীণ। তাই আকাশ এখনও শান্ত, সরকারের নজরদারি থেকে মুক্ত। এখন লড়াইটা কেবল মাটিতে আর জলে।

''তোমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে,'' বলল মাতঙ্গী, ''এটা কোনো আবেগপ্রবণ বিদ্রোহ নয়। এটি একটি কৌশলগত বিচ্ছিন্নকরণ, স্ট্র্যাটেজিক আইসোলেশন। আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট — চট্টলাকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরকারের অর্থনৈতিক হৃৎপিণ্ড থামিয়ে দেওয়া। শাহ্‌জালালাবাদ ও চট্টলার মধ্যেকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্টের ওপর নির্ভরশীল, যা আমাদের কৌশলের জন্য বড়ো সুযোগ।

সড়ক ও রেল যোগাযোগঃ শাহ্‌জালালাবাদ-চট্টলা রুটের রেল

ও সড়ক পথে মেঘনা ও গোমতী নদীর ওপর মাত্র কয়েকটি বড়ো সেতু রয়েছে। এই সেতুগুলোতে হামলা চালালে পুরো সড়ক ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়বে।

জ্বালানি সংযোগ ঃ চট্টলা থেকে শাহ্জালালাবাদ পর্যন্ত ভূ গর্ভস্থ তেলের পাইপলাইন রয়েছে। যদি এই পাইপলাইনের রিলে স্টেশন বা পাম্পিং স্টেশনগুলো অকেজো করে দেওয়া যায়, তাহলে রাজধানীর জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। জালানি ছাড়া যেকোনো সামরিক বাহিনী অচল হয়ে পড়ে।

বিদ্যুৎ পরিষেবা ঃ প্রধান বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো অকেজো করে দিলে শহরের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়বে। প্রোপাগান্ডা স্ক্রিনগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। জনসাধারণ ক্ষেপে উঠবে।

বোঝা গেল, পুরো পরিকল্পনাটা?"

ইতিবাচক মাথা নাড়ল সবাই।

বাঁধের ওপর নমাজ পড়ার জন্য উঁচু একটা বেদী রয়েছে। মাতঙ্গী তার ওপর একটা মানচিত্র মেলে ধরল। লেজার পয়েন্টার দিয়ে দেখালো, ''আমাদের লক্ষ্য চারটি চোক পয়েন্ট। প্রথমত, পতেঙ্গার প্রধান জ্বালানি টার্মিনাল। দ্বিতীয়ত, ফৌজদারহাটের গ্রিড স্টেশন। তৃতীয়ত, কালুরঘাট ও শাহ আমানত সেতুর সংযোগস্থল। আর সবশেষে, শাহ্জালালাবাদ-চট্টলা ভূগর্ভস্থ তেল পাইপলাইনের মূল পাম্পিং স্টেশন।"

''এর সঙ্গে আরেকটা ব্যবস্থা করতে হবে, শান্ত গলায় বলল মায়া, ''সেটা হলো আমাদের পাঁচ নম্বর।"

''কী সেটা?" প্রশ্ন মাতঙ্গীর।

''কমিউনিকেশন," বলল মায়া, ''চট্টলার সামরিক ও বেসামরিক সব বেতারকেন্দ্র ও তার সঙ্গে জলের তলার ফাইবার অপটিক লাইন ধ্বংস করতে হবে। মাস্টারদার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ সমুদ্রের একটা জাহাজ বিদ্রোহীদের গতিবিধি ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে দিচ্ছিল। একই পরিস্থিতি আমাদের সঙ্গেও হতে পারে। আকাশে ওদের চোখ নেই ঠিকই, কিন্তু সমুদ্রপথে ওদের নজরদারি এখনো প্রবল। সেটাকে আগেই অকেজো করতে হবে, প্রথমে ইএমপি চার্জ দিয়ে, তারপর রিমোট কন্ট্রোলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বন্দর পরিকাঠামোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে। বন্দরে বড়সড় আগুন লাগলে বন্দরমুখী সব জাহাজের সেফটি প্রোটোকল কার্যকর হবে, ওরা বন্দর থেকে কয়েক নটিক্যাল মাইল দূরে সরে যাবে। শহরের খবর পাবে না।"

''তার পরেও কোনো শখের হ্যাম রেডিয়ো অপারেটর খবর পাঠাতে পারে।" বলল বোধিচিত্ত, ''তাছাড়া, সামরিক বাহিনীর গোপন কোনো বেতারকেন্দ্র থাকতে পারে আশেপাশে, যার খবর হয়তো আমাদের কাছে নেই।"

''ভারতীয় এজেন্সির একজন লোক আছে," বলল মাতঙ্গী, ''শাহ্জালালাবাদে গোপন সামরিক কমিউনিকেশন কোর-এ। তাকে বলে দেবো, চট্টলা থেকে যাওয়া সব জরুরি বার্তা আমাকে রিলে করে জানাতে।"

''তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা করা যাক," বলল থুরা।

''হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি," বলল মায়া, ''আজ রাতেই!"

''এত তাড়াতাড়ি সব প্রস্তুতি শেষ করতে পারবে?" বলল মাতঙ্গী।

''সব ব্যাবস্থা হয়ে যাবে," আশ্বস্ত করল মায়া, ''বহুদিন ধরে আমরা এই দিনটার জন্য একটু একটু করে তৈরি হচ্ছিলাম।"

''এত তাড়াতাড়ি ইএমপি চার্জ জোগাড় হবে কীকরে?" থুরা প্রশ্ন করল।

''জোগাড় হয়েই আছে," হেসে বলল নীলা, ''চট্টলা দুর্গ থেকে ড্রোনের ভাঙা টুকরোগুলো জোগাড় করে সেগুলো দিয়ে ইএমপি চার্জ বানাচ্ছিলাম গত কয়েক মাস ধরে। সেগুলো এবার কাজে লাগবে।"

''জিনিয়াস," উচ্ছ্বাসের স্বরে বলল মাতঙ্গী।

''নীলা," নির্দেশ দিল মায়া, ''তুমি নদীর নীচে ইএমপি চার্জগুলো লাগানোর দায়িত্ব নাও, ওটা তোমারই সাবজেক্ট। বোধিচিত্ত, তুমি ফৌজদারহাটের ব্যাবস্থা করবে। পতেঙ্গার দায়িত্ব নেবে অমিতাভ। কালুরঘাট সেতুর দায়িত্ব নিচ্ছে মৈত্রী, আর শাহ আমানত সেতু তথাগতর দায়িত্ব। আমরা বাকি যারা রয়ে গেলাম, তারা সবাই ছোটো নৌকোগুলো নিয়ে নীলাকে গার্ড দেবো, যাতে ও সময়মতো চার্জগুলো ফাটাতে পারে। নীলার কাজ শেষ হলে আমরা সরাসরি বন্দরের দিকে যাবো, সেখানে নিরাপদ দূরত্ব থেকে রিমোট কন্ট্রোলে বন্দর জুড়ে বিস্ফোরণ ঘটাবো। এরমধ্যে কোস্ট গার্ডরা এসে পড়লে তাদেরকে সামলানোর দায়িত্ব আমাদের।"

থুরাকে তবু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। মায়া প্রশ্ন করল, ''কী হলো, পরিকল্পনা পছন্দ হয়নি? কোনো সমস্যা রয়েছে?"

''তুমি একটা কথা বারবার বলো," মায়াকে বলল থুরা, ''জামাতের লোকেরা ওদের ভুল থেকে খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষা নেয়। আমরা ওদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা লড়াই জিতলাম গত এক বছর, তার বিরুদ্ধে ওরা কি আর কোনো পালটা পরিকল্পনা করছে না? হয়তো ওরা কোনো ফাঁদ পেতেছে?"

''সেরকম একটা সম্ভাবনা তো আছেই," বলল মায়া, ''কিন্তু এমন কোনো খবর এখনও আমার কাছে আসেনি। শুধু আন্দাজের ভিত্তিতে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা কি ঠিক?"

''না, তা আমি বলছি না," মাথা নেড়ে বলল থুরা, ''কিন্তু আমরা যাতে আমাদের কাজটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে পারি, তার জন্য ওদেরকে আজ রাতটা ভুল বুঝিয়ে রাখতে হবে।"

''সেটা কীভাবে?" মাতঙ্গীকে আগ্রহী দেখালো।

''তুমি তো জানো," মাতঙ্গীকে বলল থুরা, ''মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স দাঁড়িয়ে আছে মানুষের মনস্তত্ত্বের ওপর। একটা লোককে একই মিথ্যে খবর যদি তিনটে ভিন্ন উৎস থেকে খাওয়ানো যায়, তবে লোকটা সেই মিথ্যেটাকেই সত্যি বলে ভেবে বসে।

চলো, আজ একটা নতুন মিথ্যে তৈরি করা যাক। এতে পুরোটা না হলেও শাহ্জালালাবাদের মনোযোগের অন্তত সিংহভাগ আজ রাতের জন্য ভুল দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে। মিথ্যে খবরের জল্পনায় ওরা রাত্রে ব্যস্ত থাকবে, আমরা সেই ফাঁকে কার্যসিদ্ধি করে বেরিয়ে যাব। একটা খবর চাউর করা যাক যে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়ে এসেছে। এর পাশাপাশি আমার সঙ্গে মায়ার একটা বড়ো রকমের ঝগড়া হয়ে গেছে। আজ রাতেই আমি আরাকানে ফিরে যাচ্ছি। আরাকান আর্মির ইন্টেলিজেন্স বিভাগকে দিয়ে মিথ্যে রেডিয়ো চ্যাটার তৈরি করছি, যাতে এই খবরটা এদিককার বর্ডার গার্ডদের কাছে পৌঁছে যায়। এর পাশাপাশি ওরা আজ রাতে বর্ডার শান্ত রাখবে, কোনো গুলিগোলা চালাবে না। ভাবটা এমন রাখবে যেন আমাকে আরাকানে ফিরে যাওয়ার সেফ প্যাসেজ দিতেই ওরা গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখছে।"

''খুব ভালো প্ল্যান,'' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মাতঙ্গী, ''শাহ্জালালাবাদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে ভারতের লোক আছে। আমি তাদের মাধ্যমে একই খবর পাঠাচ্ছি।"

''আমি সেটাই ভাবছিলাম,'' বলল থুরা।

''তুমি বলেছিলে মিথ্যে খবর তিনটে ভিন্ন উৎস থেকে খাওয়াতে হবে,'' বলল মায়া, ''এটা তো দুটো হলো। তিন নম্বরটা কোনটা?"

''কেন?'' অবাক হলো থুরা, ''জামাতিদের মধ্যে এক্স-মুসলিমদের নেটওয়ার্ক আছে তোমার। তাদের মাধ্যমে একই খবর ছড়িয়ে দাও। কী, পারবে না?"

''হয়ে যাবে,'' বলল মায়া। ওর গলার আত্মবিশ্বাসের অভাবটা সবার নজর এড়িয়ে গেলেও মাতঙ্গী সেটা খেয়াল করল।

গুনগুন করে কোনো একটা গান গাইছিল থুরা। সুরটা চেনা লাগলেও গানটা কী, বুঝতে পারছিল না কেউ। শেষমেশ মায়া জিজ্ঞেস করল, ''কী গান এটা?"

''আমার ঠাকুর্দা এই গানটা খুব গাইতেন,'' বলল থুরা, ''ছোটবেলায় শুনেছি, কথাগুলো খুব একটা মনে নেই। কিন্তু সুরটা মনে আছে। গানটা অনেকটা এইরকম,

লাল লালা / লাল লালা / লা লা / লা লা / লা,
কত / পরাঁ / হল / প-লি-দান,
লে-খা / আ-ছে / অক-ছু / জ-লে ...."



থুরার আরাকান উচ্চারণের আড়ালে বাংলা গানটা চিনতে অসুবিধে হলো না মাতঙ্গীর। ও গুনগুন করে উঠল,

''মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হল বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে ...."

চশমা খুলে চোখের জল মুছলো থুরা। বহু যুগ পরে গানটা আবার শুনল। হ্যাঁ, এখন কথাগুলো আবার মনে পড়ে যাচ্ছে। ঠাকুর্দার মুখটা তবু ঠিকমতো মনে করতে পারল না থুরা। ঝাপসা একটা অবয়ব। সোনালি ফ্রেমের গোল চশমাটাই শুধু মনে পড়ে। ঠিক ওর নিজের চশমাটার মতো। নেতাজী সুভাষ বোসের চশমার মতো।



পণ্যবাহী জাহাজগুলো যেন ঘুমন্ত তিমি, অলস গতিতে ভেসে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় ডেকের ওপর আবছায়া আভা, নদীর গভীরে মাছধরা ট্রলারের ছদ্মবেশে বিদ্রোহীরা ইএমপি চার্জ বসাচ্ছিল। লক্ষ্য, নদীর তলার ফাইবার অপটিক কেবল ও বন্দরের সেন্সর নেটওয়ার্ক অকেজো করা।

থুরা পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, ''বন্দর জুড়ে ডেটোনেটর লাগানো হয়ে গেছে। এদিকের কাজও তো দেখছি ভালোই এগোচ্ছে। হুঁ, চট্টলা বন্দর অচল মানে পূর্ব খোরাসানের ৯০ শতাংশ রসদ আমদানি বন্ধ। সাপ্লাই বন্ধ হলে মিলিটারি তিন দিনের বেশি টিকবে না।"

পাশে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার চোখে মাতঙ্গী নীচু স্বরে বলল, ''কোস্ট গার্ডের টহল প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর। একবার পার হলে অনেকটা সময় পাবে।"

''পনেরো মিনিটই যথেষ্ট,'' মায়ার উত্তর এল দৃঢ় কণ্ঠে, ''চার্জগুলোর পরপর বিস্ফোরণ হবে,'' বলল মায়া, ''নদীর নীচে ফাইবার পাইপের মাধ্যমে চেইন রিঅ্যাকশন হয়ে মূল স্পাইনটা জ্বলে যাবে। একবার কাজ হয়ে গেলে শহরের পুরো কমিউনিকেশ গ্রিড অচল হয়ে যাবে। এমনকী বলা যায় না, পুরো পূর্ব খোরাসানের ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যেতে পারে।"

মাতঙ্গী ইতস্তত করে বলল, ''একটা কথা মাথায় রেখো। একসঙ্গে কমিউনিকেশন আর পাওয়ার গ্রিড যদি খুব দ্রুত ভেঙে পড়ে, তবে ওয়াটার পাম্প, হাসপাতাল — সব অন্ধকার হয়ে যাবে।"

মায়ার চোয়াল শক্ত হলো। ''ওরা অনেকদিন অন্ধকারে বেঁচে আছে,'' বলল মায়া, ''আর কয়েকটা রাত ওদেরকে মারবে না, বরং সবাইকে বাঁচিয়ে দেবে। জ্বালানি সংযোগ বন্ধ করাটা সবচেয়ে জরুরি। অমিতাভ নিশ্চয়ই কাজটা সময়মতো শেষ করতে পারবে, কী বলো?"

''অবশ্যই, বিশ্বাস রাখো।" মাতঙ্গী একমত হলো। ''রাজধানীর

সামরিক গাড়ি আর জেনারেটরগুলো এই তেলের ওপর নির্ভর করে। ওটা গেলে শাহ্‌জালালাবাদের যুদ্ধযন্ত্র স্থবির হয়ে পড়বে।"

"ওঁম তারে তুত্তারে তুরে, বজ্রজ্বল ফট্ ফট্!" হুঙ্কার দিল মায়া।

"রক্ষ রক্ষ স্বাহা!" সমবেত হুঙ্কারে চট্টলা বন্দর কেঁপে উঠল।



মাঝরাতে অপারেশন শুরু হলো।

কর্ণফুলী নদীর বুকে আজ আক্ষরিক অর্থেই কালবৈশাখী প্রলয় নেমেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। শ্রাবণের ধারার মতো অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, পাল্লা দিয়ে বইছে হিংস্র হাওয়া। ছোটো ছোটো ঢেউগুলো ক্রুদ্ধ গর্জনে নৌকোগুলোর গায়ে আছড়ে পড়ছে। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা যেন কোনো অদৃশ্য চাবুক, গায়ে আর মুখে সপাং সপাং করে পড়ছে। ছোট নৌকোগুলো ঢেউয়ের তালে খড়কুটোর মতো দুলছে। সবার পরনের কাপড় সপসপে ভেজা, হাড়ে কাঁপুনি ধরানো শীত। কিন্তু কারও মুখে ক্লান্তি নেই, আছে শুধু অদম্য জেদ আর স্বাধীনতার গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রত্যয়।

মাতঙ্গী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ কী তারিখ, খেয়াল করেছো?"

"আঠেরোই এপ্রিল," বলল মায়া, "কেন বলো তো?"

"নিজের অজান্তেই আমরা এই তারিখটা বেছে নিয়েছি," বলল মাতঙ্গী, "নাকি ভাগ্যদেবীই সেটা আমাদের জন্য বরাদ্দ করে দিয়েছেন?"

কিছুক্ষণ মাতঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মায়া। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল, "গম্ ওয়ে!"

"হুঁ," বলল মাতঙ্গী, "আঠেরোই এপ্রিল, উনিশশো' তিরিশ। মাস্টারদার বিদ্রোহ।"

মাঝেমাঝেই বিদ্যুৎ চমকে পুরো নদীর বুক মুহূর্তের জন্য দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সেই ক্ষণিক আলোয় দেখা যাচ্ছে, কর্ণফুলীর দু'পাড়ের নিবিড় জঙ্গলে বাতাসের তাণ্ডব। মায়ার চোখদুটো বিদ্যুতের আলোয় জ্বলছে, শক্ত হাতে বোটের হুইল ধরে আছে। বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগছিল গায়ে। মায়ার বোট সবার আগে। হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে রেডিয়োতে একটা অচেনা সিগন্যাল ভেসে এল।

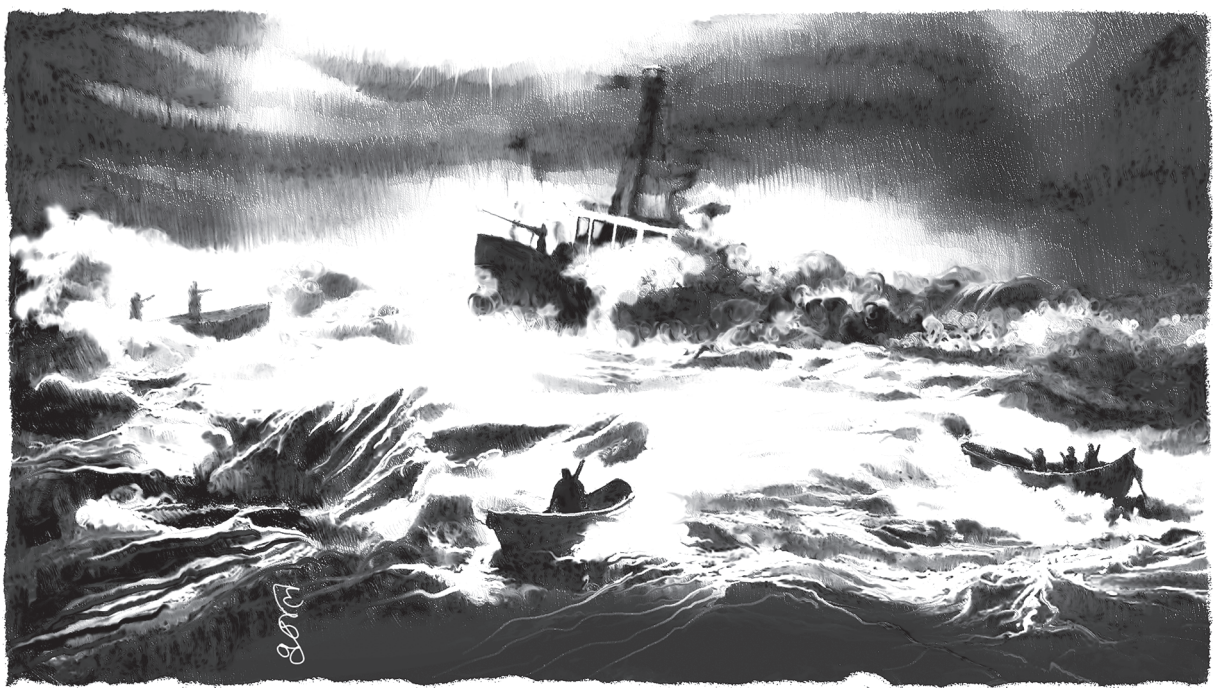
"জনাব .... — শশশ — বি এন এস বখতিয়ার খিলজি হিয়ার .... বিদ্রোহী বোট দ্রুত এগোচ্ছে .... — শশশ — কোঅর্ডিনেট আপলিঙ্ক করা হয়েছে ... — শশশ — সকল কোস্ট গার্ড ইউনিট, ইন্টারসেপ্ট করুন .... রিপিট, ইন্টারসেপ্ট করুন ..... ওভার!"

শিরদাঁড়া দিয়ে একটা আতঙ্কের স্রোত নেমে গেল মায়ার।

"ওরা জানল কী করে?" মাতঙ্গীর চোখ বড়ো হয়ে গেল, "নেভির জাহাজ এখানে এল কীকরে? তারমানে কাল রাতে সবকটা জাহাজ ধ্বংস হয়নি? বি এন এস বখতিয়ার খিলজি অন্য কোথাও ছিল?"

মুহূর্তের মধ্যে দক্ষিণ তীরে সার্চলাইট জ্বলে উঠল। নেভির জাহাজ থেকে ফায়ার করা মেশিনগানের গুলিতে নদীর জল তোলপাড় হয়ে গেল।

"অ্যাম্বুশ! আমাদের ফাঁদে ফেলা হয়েছে!" কেউ একজন



চিৎকার করে উঠল।

শান্তস্বরে মায়া বলল, ''আমি বুঝতে পেরেছি, কী হয়েছে, কে আমাদের বিশ্বাসঘাতক। আরিফ! সম্প্রতি ওর মেয়ে রেডিয়েশন ইন্ডিউসড ক্যান্সারে লিভার ফেইল করে মারা গেছে। তারপর থেকেই আল্লার গজব আর জাহান্নামের ভয় ওকে পেয়ে বসেছে!''

''আমাদের পরিকল্পনার কতটুকু জানে আরিফ?'' মাতঙ্গীর কণ্ঠে চাপা ক্ষোভ।

''সবটা নয়,'' মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল মায়া, ''তবে ওর কাছে ভাসাভাসা একটা ধারণা আছে। আমরা যে ঈসা খানের পতনের সুযোগ নেব, আর সেটা খুব শিগগিরই, এটা আন্দাজ করা ওর পক্ষে কঠিন নয়।''

''নির্দিষ্ট কী খবর আছে ওর কাছে?'' মাতঙ্গীর কণ্ঠে দৃঢ়তা, ''শুধুমাত্র আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে নিশ্চয়ই এখানে নেভির জাহাজ উপস্থিত হয়নি। বিশেষ করে এরকম পরিস্থিতিতে, যেখানে নৌবহরের একটা বড়ো অংশ এখন জলের তলায়।''

''ও শুধু এটুকুই জানে যে,'' বলল মায়া, ''আমি আজ একা নৌকো নিয়ে ঈসা খানের ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করতে আসবো। ওকে বলেছিলাম, নৌবাহিনীর রাডার যাতে এই সময়টা বন্ধ করে রাখে। তবু, এখনো জেতার সুযোগ রয়েছে। আরিফ শুধু আমার অবস্থান জানে, আর কারোর কথা জানে না।''

কণ্ঠার বোতামে চাপ দিয়ে অন্য নৌকোগুলোতে সঙ্গীদের খবর পাঠালো মায়া, ''তোমরা ভয় পেয়ো না, এখনো সবটাকে গুটিয়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। বাকিদেরকে কাজ সমাধা করবার সুযোগ দিতে হবে। বুলেট খেয়ে সময় কিনতে হবে, তারমধ্যেও বেঁচে থাকতে হবে। নদীর ওপর গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। সরাইঘাটের যুদ্ধের কথা তোমাদের অনেকবার বলেছি, মনে আছে তো? সেই পদ্ধতি নাও।''

নদীবক্ষে শুরু হলো এক অসম যুদ্ধ।

কালো মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে বিস্তীর্ণ নদীটা দেখতে লাগছিল যেন উত্তাল কোনো মহাজাগতিক যুদ্ধক্ষেত্র। ঝড়ের দমকে জল ফুলে উঠছে, ঢেউ আছড়ে পড়ছে নৌকোর গায়ে। দূর থেকে নেভির যুদ্ধজাহাজটা অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে ---বিশাল, লৌহদেহী, যেন নদীর বুক চিরে জেগে ওঠা কোনো প্রাগৈতিহাসিক জলদানব। তার সামনের ডেকে বসানো স্বয়ংক্রিয় কামান ঘুরে দাঁড়াল।

পরমুহূর্তেই---ধুম ধুম ধুম ধুম!

কয়েকটা আগুনের গোলা ছিটকে বেরোলো রাতের অন্ধকার চিরে। বিস্ফোরণের আলোয় মুহূর্তের জন্য নদী রক্তিম হয়ে উঠল।

প্রথম গোলাটা গিয়ে আঘাত করল বিদ্রোহীদের একটা নৌকোয়। পুরো নৌকোটা মাঝ-আকাশে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। জ্বলন্ত কাঠ, মানুষের শরীর আর ধাতব টুকরো ছিটকে পড়ল নদীতে।

চিৎকার।

ধোঁয়া।

জ্বলন্ত তেলের গন্ধ।

আকাশের বুক চিরে একের পর এক আগুনের গোলা নেমে এল।

কিন্তু তবু বিদ্রোহীরা থামল না।

ওরা বড়ো কোনো যুদ্ধজাহাজ আনেনি। সরাইঘাটের অহোমদের মতোই ওদের শক্তি হলো গতি, নদীর আনাচকানাচের পরিচিতি, ছোটো নৌকো চালানোর দক্ষতা আর সংখ্যার উন্মত্ত সাহস। কয়েক ডজন ছোটো ছোটো ইঞ্জিনচালিত নৌকো বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়ল নদীর বুক জুড়ে। কেউ সরাসরি এগোচ্ছে, কেউ ঘুরে যাচ্ছে চর আর অগভীর খাঁজের ভেতর দিয়ে।

নেভির বিশাল জাহাজটা কামান ঘোরাতে ঘোরাতেই সময় হারাচ্ছে। ছোটো নৌকোগুলো জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের মতো।

একটা নৌকো ঠিক কামানের সামনে চলে এসেও আচমকা বাঁক নিল। গোলাটা তার পাশ ঘেঁষে নদীতে আঘাত করল। বিকট বিস্ফোরণে বিশাল জলস্তম্ভ উঠে গেল আকাশে। বৃষ্টিধারার মতো জল এসে পড়ল আশেপাশের নৌকোগুলোর ওপর।

মায়া দাঁড়িয়ে ছিল সামনের নৌকোর মাথায়। ভিজে চুল মুখে লেপটে আছে। চোখ স্থির। চারপাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে গুলি উড়ে যাচ্ছে।

ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! ট্র্যাট! নেভির ডেক থেকে ভারী মেশিনগান আগুন ছুঁড়ছে। গরম সিসে জলে আঘাত করে ছোটো ছোটো বিস্ফোরণের মতো জল ছিটকাচ্ছে। একটা গুলি এসে মায়ার নৌকোর কাঠের পাশ ভেদ করল। কাঠের টুকরো উড়ে এসে কপালে গভীর ক্ষত করে দিল। ঠিক তখন মাতঙ্গী ওকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিল। পরের মুহূর্তেই যেখানে মায়া দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে গুলির ঝাঁক এসে আঘাত করল।

মাতঙ্গী হাঁটু গেড়ে বসে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক তুলে আগুনবৃষ্টি শুরু করল। বন্দুকের নল লাল হয়ে উঠল— টা-টা-টা-টা-ট!

নেভির জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সেনা ঝাঁকুনি খেয়ে পড়ে গেল। আরেকজন আড়ালে ঢুকতে গিয়ে রেলিং টপকে নদীতে পড়ে গেল।

''ডান দিক ঘোরাও!'' চিৎকার করল মাতঙ্গী।

থুরা সঙ্গে সঙ্গে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল। নৌকোটা ঢেউ কেটে তীব্র বাঁক নিল। সবাই প্রায় ছিটকে পড়ছিল, অনেক কষ্টে সামলে নিল।

পেছনে আরেকটা বিদ্রোহী নৌকো গোলার আঘাতে জ্বলে উঠেছে। তবু তার মাঝি শেষমুহূর্ত পর্যন্ত স্টিয়ারিং ছাড়েনি। জ্বলন্ত নৌকোটা সরাসরি নেভির জাহাজের দিকে চালিয়ে দিল সে।

''ওঁম তারে তুত্তারে ....''

''জয় তারা!''

চিৎকার মিশে গেল ঝড়ের গর্জনে।

জ্বলন্ত নৌকোটা গিয়ে আঘাত করল যুদ্ধজাহাজের পাশে।

ধাম্ম!

বিস্ফোরণে পুরো নদী কেঁপে উঠল। জাহাজের খোলের ইস্পাত বাঁকিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ল ডেকে। কয়েকজন নেভি সেনা আগুনে জ্বলতে জ্বলতে নদীতে ঝাঁপ দিল।

কিন্তু যুদ্ধজাহাজটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তার ডেকের ওপর থেকে আবার কামান ঘুরছে।

মায়া রকেট লঞ্চারটা হাতে তুলল। জল আর ঘামে হাত পিছলে যাচ্ছে। মাতঙ্গী একহাতে ওর কাঁধ চেপে ধরে ভারসাম্য দিল।

''এখন!''

মায়া নিঃশ্বাস আটকে ট্রিগার টিপল।

ফসসসস!

রকেটটা আগুনের রেখা টেনে ছুটে গেল নিকষ অন্ধকারের মধ্যে।

ঠিক তখন নেভির জাহাজ থেকেও গুলি ছুটে এল।

একটা ভারী গুলি এসে পাশের নৌকোটাকে দু'টুকরো করে দিল। মানুষজন ছিটকে পড়ল জলে। কেউ ভেসে উঠল, কেউ আর উঠল না। নদীর কালো জল ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠতে লাগল।

রকেটটা গিয়ে আঘাত করল জাহাজের রাডারের নীচে। বিস্ফোরণের সঙ্গে আগুন আর ধোঁয়া বেরিয়ে এল। পুরো জাহাজ কেঁপে উঠল। বিদ্রোহীদের নৌকোগুলো সেই সুযোগে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল যুদ্ধজাহাজটাকে।

এ যেন সরাইঘাটেরই পুনরাবৃত্তি — শুধু পালতোলা নৌকোর জায়গায় এখন ইঞ্জিনচালিত দ্রুতগামী বোট, তির-ধনুকের জায়গায় মেশিনগান আর রকেট লঞ্চার। কিন্তু যুদ্ধের আত্মা একই।

মায়ার নৌকো জাহাজের এত কাছে চলে এসেছে যে এখন ডেকের সেনাদের মুখও দেখা যাচ্ছে। ভয়, ক্রোধ, বিভ্রান্তি — সব স্পষ্ট।

একজন নেভি কমান্ডো ডেক থেকে দড়ি ছুঁড়ে তাতে ঝুলে পড়ল, মুহূর্তে পৌঁছে গেল মায়ার নৌকোয়। মাতঙ্গী এক লাথিতে লোকটাকে নৌকোর খোলের ওপর ফেলে দিল। ঠিক সেই সময় প্রবল ধাক্কায় নৌকো নড়ে উঠল, মাতঙ্গী পড়ে গেল তার পাশেই।

কমান্ডোটা ছুরি বের করল। বজ্রপাতের আলোয় ফলাটা চকচক করে উঠল।

কমান্ডো নাইফের ধারালো ফলা মাতঙ্গীর গলার দিকে আঘাত করল। মাতঙ্গী লোকটার কবজি চেপে ধরল। দু'জনের হাত কাঁপছে, পেশি ফুলে উঠেছে। নৌকো ঢেউয়ে দুলছে, ভারসাম্য রাখা কঠিন।

কমান্ডোটা হাঁটু তুলে মাতঙ্গীর পেটে আঘাত করল। প্রাণায়ামের শক্তি ব্যবহার করে মাতঙ্গী পেটটাকে বজ্রকঠোর করে তুলল, পেটের আঘাত কোনো ক্ষতি করতে পারল না। সুযোগ বুঝে লোকটা আবার ছুরি চালাল। মায়া পাশ থেকে এসে রাইফেলের বাঁট সজোরে বসিয়ে দিল লোকটার মুখে।

ঠাস!

লোকটার নাক থেঁতলে গেল। টাল খেয়ে পড়তেই মাতঙ্গী লোকটার কবজি মুচড়ে ছুরিটা ফেলে দিল নদীতে। তারপর এক ধাক্কায় লোকটাকে জলে ঠেলে ফেলে দিল। সেই মুহূর্তে মায়া একঝাঁক গুলি চালালো লোকটার ওপর।

মাতঙ্গীর গলা থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। নদী তখন জ্বলছে। চারদিকে ভাসছে আগুন, ধোঁয়া, রক্ত আর ভাঙা কাঠ। আর সেই জ্বলন্ত নদীর বুক চিরে বিদ্রোহীদের ছোটো ছোটো নৌকোগুলো এখনো হানা দিয়ে চলেছে যুদ্ধজাহাজটার ওপর, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। ইতিমধ্যে কাঁটায় কাঁটায় রাত একটা বাজল। মায়া রেডিয়োতে সংকেত দিল, ''কোডঙ্খ ব্ল্যাকআউট।''

মুহূর্তের মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো বিস্ফোরণ ঘটল। বোধিচিত্তর স্থলবাহিনী ফৌজদারহাটে মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র উড়িয়ে দিল। মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল পুরো চট্টলা। অমিতাভর নেতৃত্বে পতেঙ্গার পাম্পিং স্টেশনে বিস্ফোরণের ফলে শাহ্জালালাবাদ-চ ট্টলা ফুয়েল পাইপলাইনের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। মৈত্রী ও তথাগতর আক্রমণে কালুরঘাট সেতু ও শাহ আমানত সেতু দুটোই একসঙ্গে তুমুল শব্দ করে নদীর গর্ভে তলিয়ে গেল। ঠিক এই সময় নীলার নেতৃত্বে নদীর নীচে ইএমপি চার্জগুলো ফাটলো। এক তীব্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বন্দরের সব ডিজিটাল লজিস্টিক সিস্টেম এবং রাডার অকেজো হয়ে গেল। বন্দরের স্বয়ংক্রিয় গেটগুলো লক হয়ে গেল। জাহাজগুলো মাঝনদীতে আটকা পড়ল। রাজধানীর কেন্দ্রীয় কমান্ডের সঙ্গে সঙ্গে চট্টলার সংযোগকারী সব ডিজিটাল সিগন্যাল এখন মৃত।

মাতঙ্গী ওভাররাইড রিমোট কন্ট্রোল সুইচটা টিপল।

এক সেকেন্ড।

দুই সেকেন্ড।

তিন সেকেন্ড।

কিছুই হলো না।

মাতঙ্গী আবার ওভাররাইড সুইচ টিপল।

এবারও কিছুই হলো না।

''ডেটোনেটরগুলো কাজ করছে না কেন?'' হতভম্ব মায়া।

অবাক মাতঙ্গীও, ''ওগুলো কি খারাপ হয়ে গেল?''

''এতগুলো ডেটোনেটর একসঙ্গে খারাপ হয়ে যেতে পারে না,'' গম্ভীর স্বরে বলল থুরা, ''জাহাজটায় নিশ্চয়ই সিগন্যাল জ্যামার আছে।''

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো মায়া। তারপর হালের চাকা ঘুরিয়ে দিল বন্দরের দিকে, ঝড়ের বেগে নৌকো চালিয়ে দিল। মাতঙ্গী একের পর এক গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে যন্ত্রণা থেকে মনটাকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল। গলায় ছুরির গভীর ক্ষত। পায়ে, কাঁধে, হাতে গুলির

আঘাত। ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। মাথা ঘোরাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এক্ষুনি চোখদুটোয় অন্ধকার নেমে আসবে।

নৌকো যখন বন্দরের থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে পৌঁছল, তখন মায়া বলল, ''এইবার!''

''বিস্ফোরণের আঘাত কিন্তু এই নৌকোতেও এসে পৌঁছবে,'' ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ গলায় বলল মাতঙ্গী। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে আবার ওভাররাইড সুইচটা টিপল। একটা অন্ধ করা আলোর ঝলকানিতে বন্দরজুড়ে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটল। জলোচ্ছ্বাসে অন্ধ হলো চোখ। নৌকোর মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল সবাই।

ধোঁয়া পরিষ্কার হলো, নদীর জল কাটতে কাটতে মায়া উঠে দাঁড়ালো। থুরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল, জামা পুড়ে গেছে, চামড়া ঝলসে গেছে, পায়ে একরাশ স্প্লিন্টারের ক্ষত।

''কাজ শেষ,'' থুরা বলল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মায়া।

''না,'' আর্তনাদ করে উঠল মাতঙ্গী। একটা বস্তার ওপর ঠেস দিয়ে শুয়ে আছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে, হাতে স্যাটেলাইট ফোন। ''রাজধানীর অপারেটিভ এইমাত্র জানালো, শহরের মধ্যে থেকে কেউ একটা বেতার তরঙ্গে খবর পাঠাচ্ছে। অর্থাৎ, মাস্টারদা যে পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন, আমরাও ঠিক সেই বিপদেই পড়েছি।''

মায়া শহরের দিগন্তের দিকে তাকালো। গোটা শহরটা অন্ধকার। অন্ধকার আকাশটাও। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু মিনারে তখনও আলো জ্বলছে। মাথা নেড়ে বলল, ''একটা কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, ওই দ্যাখো!''

দ্রুত হালের চাকা ঘুরিয়ে মায়া নৌকো তীরের দিকে ভিড়িয়ে দিল। দূরে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই উঁচু টাওয়ার, যা এখন প্রোপাগান্ডা নয়, সামরিক সিগন্যাল ট্রান্সমিটার আর বুস্টার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

''তোমার কাছে ব্যাকআপ ডেটোনেটর আছে?'' থুরাকে জিজ্ঞেস করল মায়া।

বোটের খোলের বাক্স হাতড়ে ডিনামাইটের একটা বান্ডিল খুঁজে বের করল থুরা, হতাশার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, ''একমাত্র এটাই রয়েছে। কিন্তু এটাকে তো রিমোট কন্ট্রোলে ফাটানো যাবে না।''

''এটাই যথেষ্ট,'' বলল মায়া, ''আমি এটাকে দূর থেকে ছুঁড়ে দেব। পুরোনো দিনের ভাঙাচোরা টাওয়ার, এক ধাক্কাতেই পড়ে যাবে।''

মায়া বান্ডিলটা হাতে নিল। ওর মনে পড়ল, ঠাকুমার মুখে অনেক শুনেছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কয়েকটা অসমসাহসী যুবকের আত্মবলিদানের কথা। ১৯৩০ সালের সেই বিপ্লবীদের কথা, যারা অস্ত্রাগার হস্তগতর পর পাহাড়ের বুক আগলে লড়েছিল। এতগুলো বছর পরে লড়াইয়ের ধরন বদলেছে, কিন্তু তার মূলভূত ধর্ম, তার আবেগ বদলায়নি।

মায়ার হাত চেপে ধরল মাতঙ্গী। নীরবে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নৌকোর খোল থেকে একটা বাইসাইকেল টেনে বের করল মায়া। ছুঁড়ে দিল পাড়ের দিকে। তারপর নিজেও ঝাঁপ দিল অগভীর জলে।

ওপারে উঠে বাইসাইকেলটা মাটি থেকে তুলে তাতে চড়ে বসল মায়া। পেছন ফিরে তাকাল। জল কাদা আর ঝুলকালি মাখা মুখে হাসল।

''হয়তো আমরা কেউ কেউ আর কাল সকালে থাকব না,'' বলল মায়া, ''কিন্তু কাল সকালে যখন এই বন্দর খুলবে না, যখন রাজধানীর সাঁজোয়া গাড়িগুলো তেলের অভাবে থেমে যাবে, যখন প্রতিটি ফোনে 'নো সিগন্যাল' দেখা যাবে, তখন মানুষ বুঝবে, স্বাধীনতা আর মাত্র কতটুকু দূরে।''

হঠাৎ সন্দেহ হলো থুরার। পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, ''মায়া! 'দূর থেকে ছুঁড়ে দেব'? মিথ্যে বলেছিস! তুই তো আর ফিরবি না।''

''রহমান ঘরে যেদিন ঢুকেছিলাম,'' চেঁচিয়ে বলল মায়া, ''সেদিনই ভেবেছিলাম, আর ফিরব না। লোকটাকে মেরে আমিও মরব। তোমার জন্যই সেটা হয়নি। তারপর এতগুলো দিন যে বেঁচে আছি, সেটাই তো বোনাস। বাঁচার ইচ্ছে আমার অনেকদিন আগেই ফুরিয়ে গেছে। চট্টলাবাসীর মনে এক প্রেত হয়েই আমি বেঁচে থাকব।''

বন্দরের জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলছে। সেই আগুনকে পাশ কাটিয়ে মায়া বাইসাইকেল নিয়ে শহরে ঢুকে পড়ল।

সূর্য তখন সবে উঁকি মেরেছে শহরের বাড়িগুলোর পেছন থেকে। দক্ষিণের বস্তিগুলোর ওপর দিয়ে মায়া বাইসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। দেখল, উন্মত্ত জনতা আজ পথে নেমেছে। ওর মনে পড়ল, দশ বছর আগে এরকমই একটা উন্মত্ত মিছিল ও দেখেছিল এই রাজপথে। সেই মিছিলের স্লোগান ছিল, কাফেরদের গর্দান চাই। আজ তাদের মুখে অন্য স্লোগান। সাধারণ মানুষ আজ পাথর ছুঁড়ে প্রোপাগান্ডা স্ক্রিনগুলো ভেঙে ফেলছে, লাউডস্পিকার চুরমার করছে, দেওয়ালে দেওয়ালে পুরনো জনজাতীয় চিহ্ন আঁকছে। সাপ, প্যাঁচা, ফুল, বাঁশি, পদ্মফুল, ওঙ্কার, স্বস্তিক, ত্রিশূল। যেগুলো আঁকা এতকাল ছিল নিষিদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের টাওয়ারের দোরগোড়ায় এসে থামল মায়া। সাইকেলটা সেখানে ফেলে রেখে গেট খুলে ঢুকলো। দেওয়ালের কাছে গিয়ে ডিনামাইটের বান্ডিলে আগুন দিল। বিড়বিড় করে বলল মায়া, ''বাবা সেদিন ধর্ম আর সঙ্ঘের মানে আমাকে বলে যেতে পারেনি। কিন্তু আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি। এটাই আমার ধর্ম। আমার সঙ্ঘ, মানে আমার সমাজের জন্য আত্মবলিদান। আমি এর জন্যই জন্মেছি।''

হঠাৎ মায়ের চুল বাঁধার সেই নারকেল তেলের গন্ধটা পেল মায়া।

গায়ের জোরে বান্ডিলটা ছুঁড়ে দিল, টাওয়ারের খোলা জানালা দিয়ে সেটা ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। চিৎকার করে বলল মায়া,

''পাহাড়ের জন্য। নদীর জন্য। যাদের মৃতদেহের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, তাদের জন্য। ওঁ স্বাহা!''

বিস্ফোরণ আগুনে গড়া সাপের মতো টাওয়ার বেয়ে ওপরে উঠে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই এক বিশাল অগ্নিপিণ্ড কর্ণফুলীর বুক চিরে জেগে উঠল। বিস্ফোটের তীব্রতায় নদীর জল কয়েক ফুট উঁচুতে নেচে উঠল। সেই কম্পন রাজধানী ছাড়িয়ে নদীর বুক চিরে চট্টলার ওপারে সমুদ্রেও লাল আভা ছড়িয়ে দিল।



দু'দিন পরের কথা। সীমান্তের পাহাড়ে থুরার পাশে বসে ছিল মাতঙ্গী। শরীর খুব দুর্বল। অপারেশন করে আধ ডজন গুলি ওর শরীর থেকে বের করতে হয়েছে। শরীরের অসংখ্য জায়গায় স্টিচ। ও যে বেঁচে আছে, সেটাই নাকি আশ্চর্য। থুরার পায়ে ব্যান্ডেজ, সঙ্গে ক্রাচ। হাইড্রো-জেল পট্টি দিয়ে ঢাকা পোড়া ক্ষতগুলো।

রেডিয়োতে খবর আসছে, চট্টলার সর্বত্র সেনাবাহিনীর লোকেরা আত্মসমর্পণ করছে, সরকারি পদস্থ অফিসাররা পালাচ্ছে, বহু বছর পর শহরের ভগ্নপ্রায় মঠগুলোতে মুক্তির ঘণ্টা বাজছে। শাহ্জালালাবাদ থেকে আসা সব সামরিক কলাম কুমিল্লার কাছে এসে থেমে গেছে। জ্বালানি আর যোগাযোগের অভাবে তারা আর এগোতে পারছে না। তাছাড়া, তুমুল সংঘর্ষ চলছে নোয়াখালীতে। ফেনী নদীর ওপরের সেতুর সলিলসমাধি হয়েছে।

চট্টলা এখন বিদ্রোহীদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। নদীর যেখানে তেল চুঁইয়ে পড়েছে, সেখানে এখনও আগুন জ্বলছে। পাহাড়ে পাহাড়ের শিশুরা গেয়ে উঠছে সেই গান, যা এক প্রজন্ম ধরে শোনা যায়নি — স্বাধীনতার গান, পূর্বপুরুষের গান, নদী আর সমুদ্রের গান।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই নতুন এক আপদ এসে হাজির হয়েছে। উপকূলের অদূরে এক রহস্যময় মালবাহী জাহাজ দেখা গেছে, সেটা কোস্টগার্ডের জাহাজ বা মাছধরা ট্রলার নয়। ভারতীয় স্যাটেলাইট থেকে তোলা বেশ কিছু ছবি এসেছে মাতঙ্গীর কাছে। সিভিলিয়ান ভেসল হলেও জাহাজটা অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই, অস্ত্রের বাক্সগুলোতে এক বেসরকারি কন্ট্রাক্টরের চিহ্ন। নাবিকদের পোশাক সিভিলিয়ান হলেও হাবভাব আধুনিক যোদ্ধাদের মতো। এরা কি আমেরিকার ভাড়াটে সৈন্য, ঘোলাজলে মাছ ধরতে আসছে? সেন্ট মার্টিন দ্বীপের ওপর আমেরিকার লোভ বরাবরের। কে বলতে পারে, হয়তো শুধুমাত্র সেন্ট মার্টিন নয়, গোটা চট্টলার ওপরেই নজর পড়েছে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর? এরই মধ্যে একদল অচেনা সশস্ত্র মানুষকে মায়ানমারের জঙ্গল ভেদ করে লোকালয়ের দিকে আসতে দেখা গেছে। ভাষা তাদের চীনাদের মতো। সীমান্ত বরাবর আরাকান আর্মির সঙ্গে তাদের কয়েকটা দলের ছোটোখাটো সংঘর্ষ হয়েছে গত কয়েকদিনে। শহরের ধ্বংসস্তূপে এখন নতুন ফিসফিসানি, তৃতীয় কোনো পক্ষ ঢুকেছে চট্টলায়।

''মায়ার কোনো খবর পেলে?'' মাতঙ্গী জিজ্ঞেস করল।

দিগন্তের দিকে তাকাল থুরা। সেখান থেকে এখনও কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আকাশে। বলল, ''মায়া বলেছিল, ও প্রেতাত্মা হয়ে বেঁচে থাকবে। আত্মারা তো কোনো খবর পাঠায় না।''

পাহাড়ের ওপারে সূর্য উঠছে। কর্ণফুলী নদী আজও বইছে, তবে আজ তার বুক জুড়ে জয়ের গান। মায়া আজ আর নেই, কিন্তু চট্টলার প্রতিটি ধ্বংসস্তূপে ওর রক্তরাঙা স্বাক্ষর চিরতরে লেখা হয়ে গেছে।

সারা আকাশ প্রদক্ষিণ করে সূর্য সমুদ্রে ডুব দিল। আবার রাত নামল। রাজধানীর ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে, ভাঙা যোগাযোগ ব্যবস্থার স্ট্যাটিক শব্দের মাঝে এক নারীর কণ্ঠস্বর ক্ষীণভাবে ভেসে এল:

''শৃঙ্খল ভেঙেছে। পাহাড় আর সমুদ্র আজ স্বাধীন। আমি গরিব মেয়ে, বাপ-মা হারা। তোমাদের জন্য শুধু একটি জিনিস রেখে গেলাম — তা হলো আমার স্বপ্ন ... নিজের সত্তা নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন। ওঁম তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা!''

সেই শব্দ একটু একটু করে ক্ষীণ হয়ে শেষে বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।



সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম



চির পরিচিত

দুলালের®

তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।

সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩



উত্তর ভিয়েতনামের একটি প্যাগোডা

ভিয়েতনাম দেখে এলাম

ডাঃ মধুসূদন পাল

কম্বোডিয়া থেকে চলে গেলাম উত্তর ভিয়েতনাম। সিএম রিপ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দু'ঘণ্টার উড়ান। নামলাম হ্যানয় বিমানবন্দরে অর্থাৎ ভিয়েতনামের রাজধানীতে। এটি একসময়ে ছিল হো-চি-মিন (১৯ মে ১৮৯০-২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)-এর প্রধান কর্মক্ষেত্র। হ্যানয় দক্ষিণ-পূর্ব চীন সংলগ্ন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অংশ দক্ষিণ চীন সাগরের তীরে। পূর্বনির্ধারিত দর্শনীয় স্থান হো-চি-মিনের স্মৃতি সৌধ হো-চি-মিন মৌসলিয়াম (Ho Chi Minh Mausoleum)। বিরাট ক্যাম্পাসে বহু গাছপালা, বিশেষত আমগাছ। হো-চি-মিন মাছ ধরতে পছন্দ করতেন, তাই সংলগ্ন কয়েকটি পুকুরে ছাড়া আছে রঙিন মাছ। একটি রাজকীয় বাড়িতে প্রেসিডেন্ট হাউস। হো-চি-মিনের বসবাসের জন্য এই বাড়িটি দেওয়া হলেও তিনি থাকেননি। এখন সরকারি অতিথি নিবাস। আগে এটি ছিল ফরাসি শাসকের বাসস্থান। হো-চি-মিনের জন্য রয়েছে একটি ছোট দোতলা বাড়ি। এক তলায় বাঙ্কার। বোমা পড়লে উনি সরাসরি বাঙ্কারে চলে যেতেন। বাঙ্কারের উপরে প্রচুর গাছপালা। হো-চি-মিনের মরদেহ মমি করে রাখা আছে। এখানে প্রবেশ করতে হয় শান্তভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে। কোনো কথা বলা যায় না। ওখানের মানুষ হো-চি-মিনকে খুবই শ্রদ্ধা করেন।

হো-চি-মিন জীবিতাবস্থায় পুরো ভিয়েতনাম পাননি। দক্ষিণ ভিয়েতনাম বিদেশি শাসনমুক্ত হয়ে ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওনার মৃত্যুর পরে। অর্থাৎ অখণ্ড ভিয়েতনামের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে হো-চি-মিন পরবর্তী সময়ে।

হো-চি-মিন ভারতেও খুব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি এদেশে আসেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তিনি কলকাতায় একটি ছোটো অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় পতাকা বিপ্লবী দেবনাথ দাসের হাতে তুলে দেন। দেবনাথ ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজির সহযোগী। কেন হো-চি-মিন জাতীয় পতাকা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কিংবা প্রধানমন্ত্রী নেহরুর হাতে তুলে দেননি, তা অনুসন্ধান করলে ইতিহাসের অনেক না দেখা পাতা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যথাসময়ে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করব।

উত্তর ভিয়েতনামে অনেক প্যাগোডা আছে। আমরা দেখতে গেলাম Temple of Literature। এটি ভিয়েতনামের সবচেয়ে পুরাতন ও এদেশের প্রথম



লিয়ন প্রচণ্ডীর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ছিল রাজপরিবারের সদস্যদের শিক্ষাদান কেন্দ্র। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের সন্তানদের জন্যও অবারিত করা হয়। পরবর্তী গন্তব্য বৌদ্ধ রাজাদের তৈরি Tran Quoc Pagoda। ১০০০-১৫০০ বছরের পুরাতন প্যাগোডা দেখে আপ্লুত হলাম। বিস্ময় যেন থই পায় না। এই ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যটিকে খুব যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে রেখেছে সরকার।

এরপর গেলাম Hoan Kiem Lake দেখতে। লেকের চারদিকে প্রচুর প্যাগোডা। প্রায় হাজার বছরের পুরানো বড়ো গাছ ভ্রমণার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছে। ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট দেশ হলেও অনেকেই এখানে ফুল-পাতা-নারকেল ইত্যাদি দিয়ে পুজো করছেন। পদ্মফুলের প্রাচুর্য। দেবতার পুজোতেও পদ্মফুল আবার হো-চি-মিনের পায়ের তলাতেও পদ্মফুল। কমিউনিস্ট দেশে এত দেবতার মূর্তি, মন্দির, প্যাগোডা দেখে ভারতের কমিউনিস্টদের দেবদেবীদের মূর্তি বিদ্বেষের কথা মনে এল। তাহলে, ভিয়েতনামের কমরেডরা কি জালি কমরেড না 'কম রেট'-এর কমিউনিস্ট?

পরবর্তী গন্তব্য— Hanoi। Ha long Bay। যাওয়ার পথে দেখলাম বিরাট সরকারি ফার্ম হাউস। এখানে সমুদ্রের জল ঢুকিয়ে তৈরি করা হয়েছে অনেক লেক। চাষ করা হয় কৃত্রিম মুক্তা। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের এটি অন্যতম ক্ষেত্র। মেয়েরাই এখানে চাষবাস-সহ সব কাজ করছে। উল্লেখ্য, বিমানবন্দরে পর্যটকদের জন্য বাস দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সেখান থেকেই নির্দিষ্ট বাসে চড়ে ঘুরেছি। দুর্ভাগ্য, ভারতের সবচেয়ে পুরাতন নেতাজী সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দমদমে বাস রাখার কোনো জায়গা নেই। অথচ এদের সব বিমানবন্দরে বাস রাখার প্রচুর জায়গা রয়েছে। পর্যটকদের জন্য সব রকমের ব্যবস্থা রেখেছে এরা। আমরা পারিনি।

আমাদের বাসটি থাকল সমুদ্রসৈকতে। ওখান থেকে ছোটো ছোটো ডিঙিতে গেলাম উপসাগরের মধ্যে যাত্রীদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা লাক্সারি ক্রুজ (Cruise)-এ। জাহাজ পর্যটকদের নিয়ে গেল উপসাগরের গভীরে। উত্তর ভিয়েতনামের সব থেকে বড়ো নদী 'রেড রিভার'। ফিরলাম রেড রিভার-এর অববাহিকার উপর দিয়ে। এর চারদিকের সবুজ ধানক্ষেত পর্যটকদের মনোহরণ করবেই। আমরাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম শ্যামলিমার দিকে। উত্তর ভিয়েতনামে চীনা সংস্কৃতি ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য।

আগের কথায় আসি। উপসাগরের ভিতর রয়েছে মাঝারি উচ্চতার হাজার হাজার পাহাড়। পাহাড়ে প্রচুর গাছপালা। পাহাড়গুলি আগ্নেয় শিলা, আর চুনাপাথর দিয়ে গঠিত। জাহাজ পাহাড়গুলোকে কাটিয়ে এঁকেবেঁকে চলতে লাগল। বেশ মজার অভিজ্ঞতা। স্বচ্ছ নীল জলের দিকে তাকিয়ে থাকলাম নিষ্পলক ভাবে।

জাহাজেই খাওয়া-দাওয়া। এরপর বাঁশের তৈরি ছোটো ছোটো ডিঙিতে চড়ে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে ঘুরতে লাগলাম। এক একটা বোটে ১০ জন যাত্রী। এই বোটে চড়ে পাহাড়ের খুব কাছে পৌঁছানো যায়। একবার কায়াকিং (Kayaking) করলাম। বোটগুলি প্লাস্টিকের তৈরি। আয়তনে বেশ ছোট। একটা বোটে দু'জন চড়া

যায়। আমরা দু'জন একটা বোটে চড়ে নিজেরাই বৈঠা টেনে ঘুরলাম খুব সাবধানে ভারসাম্য বজায় রেখে। কারণ, সামান্য এদিক ওদিক হলেই বিপদের সম্ভাবনা। এখানে জাহাজে বসে দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা জীবনের মস্তবড় অভিজ্ঞতা।

এই উপসাগর বেশ শান্ত। স্থানীয় মেয়েরা ডিঙিতে চড়ে নানারকম জিনিসপত্র, নানারকম পানীয়, সিগারেট, খাবার ইত্যাদি বিদেশী পর্যটকদের কাছে বিক্রি করছে। কেউ কেউ মাছ ধরছে ডিঙিতে। সর্বত্র মেয়েদের প্রাধান্য। এদেশের মেয়েরা সুন্দরী এবং তাঁদের বিভিন্ন পণ্য বিক্রির কৌশলও বেশ উন্নত। ফলে মেয়েরাই এসব কাজে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে।

জাহাজ থেকে নেমে বাসে চড়ে এলাম Danang বিমানবন্দরে। জায়গাটির অবস্থান মধ্য ভিয়েতনামে। যখন হো-চি-মিনের দখলে ছিল উত্তর ভিয়েতনাম, আমেরিকান বাহিনীর দখলে ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনাম, তখন Danang ছিল আমেরিকানদের হাতে। Danang-এর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান— Bana hill। বাসে চড়ে অনেক জঙ্গল পেরিয়ে গেলাম Bana hills-এর গোড়ায়। টিকিট কেটে রোপওয়ে চড়ে পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের মাথায়। পায়ের নীচে জঙ্গল, ঝর্ণা, নদী মনে রোমাঞ্চ তৈরি করতে লাগল প্রতি মুহূর্তে। পুরো শহরটা ছবির মতো লাগছিল। পাহাড়ের উপর প্যাগোডা, বুদ্ধমূর্তি এককথায় অসাধারণ। দেখলাম পাহাড়ের উপর ফরাসীদের তৈরি করা শহর। সেখানে বড়ো বড়ো হোটেল, বাড়ি, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি রয়েছে। একসময় কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা এগুলো ভাঙতে শুরু করে। পরে অবশ্য অনেকটাই সংস্কার করা হয়েছে। কারণ, ফরাসী পর্যটকরা এখানে ভালো সংখ্যায় আসে। তা থেকে ভালো রকম আয় হয় ভিয়েতনামের।

এবার গন্তব্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম। ডানাং (Danang) বিমান বন্দর থেকে বিমানে এসে নামলাম হো-চি-মিন সিটি (সায়গন)-তে। হোটেলে রাত্রি কাটিয়ে সকালে পৌঁছালাম লিয়ন প্রচণ্ডীর ভাঙা বাড়ি দেখতে। লিয়ন প্রচণ্ডী সম্পর্কে পরে বিস্তৃত বলব। কারণ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লিয়ন প্রচণ্ডীর একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। ওখান থেকে গেলাম মেকং নদীর বুকে গজিয়ে ওঠা কিছু বদ্বীপ দেখতে। বাস থেকে নেমে নৌকায় নদী অতিক্রম করে খাল-বিলে পৌঁছালাম। বারবার সুন্দরবনের কথা মনে পড়ছিল। খাল-বিলের আশেপাশের গ্রামগুলিতে প্রচুর জনবসতি। দেখলাম অসংখ্য নারকেল গাছ আর ফলবাগিচা। এরা প্রাচীন গ্রামীণ জীবনধারা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ধরে রেখেছে আন্তরিকতার সঙ্গে। দেখলাম, এবিষয়ে ওরা খুবই সংবেদনশীল।

বিকেলে গেলাম Vinh Trang Pagoda দেখতে। এই প্যাগোডা খুবই বিখ্যাত। চীন-কম্বোজ এবং ফরাসী শিল্প স্থাপত্যের মিশনে তৈরি এক অপূর্ব স্থাপত্য কীর্তি। পরদিন সকালের গন্তব্য Cuchi Tunnels। এটির অবস্থান দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক বিশাল জঙ্গলে। এখানে মাটির তলায় স্বাধীনতাকামী ভিয়েতনাম গেরিলারা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি করেছে মাইলের পর মাইল সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গের মুখগুলো মাটির উপরে। বাইরে থেকে এগুলো বোঝা



দক্ষিণ ভিয়েতনামের জঙ্গলে যুদ্ধক্ষেত্রে গেরিলাদের তৈরি শত্রু ধরার ফাঁদ, যা ঘাস-পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হতো।

মুশকিল। কারণ, সুড়ঙ্গের মুখ গাছপালা কিংবা পিঁপড়ের ঢিবি দিয়ে ঢাকা। এর ভেতরটা এত সরু যে, আমেরিকান সৈন্য সুড়ঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে ওদের বিশাল চেহারার জন্য। বাঙ্কারে রাখা আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার, জল ইত্যাদি। বিশ্রামেরও যথেষ্ট জায়গা আছে সেখানে। উপর থেকে শত্রু বিমানবাহিনীর বোমা মেরে, কিংবা পদাতিক বাহিনী নামিয়েও যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না। ১৯৭৫-এর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আমেরিকান সৈন্য পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল এখান থেকে। ভিয়েতনাম সরকার এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি খুব যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে রেখেছে।

এরপর গেলাম, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য War Remnants Museum দেখতে। শক্তিমত্ত দাম্ভিক আমেরিকা যুদ্ধক্ষেত্রে বিমান,



লিয়ন প্রচণ্ডীর ভাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেদক।

হেলিকপ্টার, ট্যাঙ্ক ব্যবহার করেছিল যথেচ্ছভাবে। তার অনেকগুলোর দখল নিয়েছিল ভিয়েতনামের গেরিলারা। আরো অনেক যুদ্ধাস্ত্র আমেরিকান সৈন্য ফেলে আসে বাধ্য হয়ে। পরবর্তীকালে ঠিক এরকমই দেখা গিয়েছিল আফগানিস্তানে। বিরুদ্ধপক্ষের ফেলে যাওয়া সামরিক অস্ত্র নিয়ে এখানেই গড়ে উঠেছে মিউজিয়াম। তথাকথিত সুসভ্য আমেরিকান সৈন্যরা ভিয়েতনামের মানুষের উপর যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল তার অসংখ্য ছবি রাখা হয়েছে এই ক্যাম্পাসের একটি বড় বাড়িতে। উন্নত সভ্যতার দাবিদার আমেরিকা। তাদের নৃশংস আচরণ এবং তাদের পতনেরও একটি ভাল স্মারক এই মিউজিয়াম। এই মিউজিয়াম দেখা প্রতিটি দেশপ্রেমিকের কর্তব্য। এরপর আমরা বিমানে ফিরে আসি কলকাতায়।

এবার আসি লিয়ন প্রচণ্ডীর কথায়। উত্তর ভিয়েতনামের ইতিহাস ও কৃষ্টিতে যেমন চীনের প্রভাব গভীর তেমনি দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়াতে প্রভাব বেশি ভারতের। দক্ষিণ ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ বহু হাজার বছরের।

একসময় ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া পরিচিত ছিল ইন্দো-চীন নামে। এখানে ফরাসীরা রাজত্ব করেছে দু'শো বছরেরও বেশি সময়। প্রায় একই সময় তারা ভারতের পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরে রাজত্ব করেছে। লিয়ন প্রচণ্ডীর জন্ম পণ্ডিচেরীতে ১৯০১ সালে। ভাগ্যান্বেষণের জন্য তাঁর যৌবন অতিবাহিত হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনে। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রভূত সম্পদের অধিকারী হন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জাপানীরা ফরাসীদের উৎখাত করে ইন্দো-চীনের দখল নেয়। সেই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে। আজাদ হিন্দ বাহিনী ও আজাদ হিন্দ সরকারের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল সায়গনে লিয়ন প্রচণ্ডীর বাড়িতে। এই সংগঠনের জন্য তিনি তার নিজস্ব বাড়ি ও উপার্জিত সম্পদ দান করেন। বাড়ির ঠিকানা— 76, HAL BA TRUNG , SAYGAN। সায়গন শহরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার সমস্ত বাড়ি হয় ভেঙে পড়েছে না হয় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আগেকার বাড়িগুলি সাধারণত ২-৩ তলা, লালচে রঙের। সায়গন শহরে এধরনের বাড়ি আছে ৪-৫টি। এখন এগুলো সবই ভারতীয় রেস্তোরাঁ। একমাত্র এই বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণ শরীর নিয়ে। আশ্চর্য, বাড়িটির দখল নেয়নি কেউ। গোটা সায়গন শহরে এই বাড়িটি যেন ব্যতিক্রম। ৮০ বছর ধরে বাড়িটি একটু একটু করে ভেঙে পড়ছে অথচ কেউ দখল নেয়নি। এর পেছনে নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ বর্তমান। আমাদের নিশ্চিত ধারণা, এটিই লিয়ন প্রচণ্ডীর সেই ঐতিহাসিক বাড়ি। ব্রিটিশদের লেখা Transfer of Power (Volume VI)-এ পরিষ্কার লেখা আছে— বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরেও 'বোসকে সায়গন শহরে

কয়েকদিন দেখা গেছে।' এটিই এই বাড়িটির প্রধান গুরুত্ব। দ্বিতীয় গুরুত্ব, হো-চি-মিন যখন ১৯৫৮-তে ভারত ভ্রমণে আসেন তখন সায়গনে নেতাজীর প্রধান কেন্দ্রে ব্যবহৃত ভারতের তেরঙা পতাকা কলকাতায় নেতাজীর সহযোগী দেবনাথ দাসকে হস্তান্তর করেন। হো-চি-মিন এই পতাকা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কিংবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে দেননি।

প্রশ্ন, হো-চি-মিন এই পতাকা কিভাবে পান? অনুমান, তাদের মধ্যে কোনো গোপন সম্পর্ক ছিল। গভীর শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তিনি ১৯৪৫-৫৮ এই ১৩ বছর পতাকাটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন। তৃতীয় গুরুত্ব হল , জাস্টিস খোসলা কমিশনে ডাঃ রামচন্দ্র রাও সাক্ষ্য দিয়েছেন— সায়গন নৌবন্দর থেকেই নেতাজী জার্মান সাবমেরিনে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পরেও লিওন প্রচণ্ডীর সঙ্গে নেতাজির যোগ ছিল এবং তিনি অন্তর্ধানের বিষয়ে সাহায্য করেছেন এই সন্দেহে তাকে ফরাসিরা বন্দি করে অত্যাচার চালায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য। পরে একই কারণে ব্রিটিশ শক্তি তার উপর এমন অত্যাচার করে যে তিনি পঙ্গু হয়ে যান শারীরিকভাবে। তাঁর মস্তিষ্ক প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাঃ রামচন্দ্র রাওকে তো স্বাধীন ভারতেও বন্দি রাখা হয়েছিল।

গোরাচাঁদ সান্যাল IPS প্রেসকে বলেন, নেতাজীর শেষযাত্রা বিমানে নয়, সাবমেরিনে। নেতাজীর ব্যবহার করা দু'টি তরবারি গোরাচাঁদ সান্যাল পেয়েছিলেন একজন জাপ অফিসারের কাছ থেকে। সুব্রত মুখার্জী (পরবর্তীকালে ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধান)-র সাহায্যে গোরাচাঁদ এই দু'টি তরবারি কলকাতায় আনেন এবং প্রেস বিবৃতি দেন! পরে গোরাচাঁদ খুন হয়ে যান উত্তর কলকাতায় নিজ বাসভবনে। তার মুণ্ডকে শরীর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জীর রহস্যজনক মৃত্যু হয় টোকিওর একটি হোটেলে।

ভিয়েতনাম ভ্রমণে নেতাজীর ১৯৪৫-এর আগস্টে সায়গন থেকে সাবমেরিনে অন্তর্ধানের বিষয়ে লিয়ন প্রচণ্ডীর সংযোগ অনুধাবন করাই ছিল ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিবেদকের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—



Usha Kamal

With Best Compliments from :

PIONEER PAPER AND STATIONERY PVT. LTD.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

LAUREL

FINANCIAL SOLUTIONS

Laurel Securities Private Limited

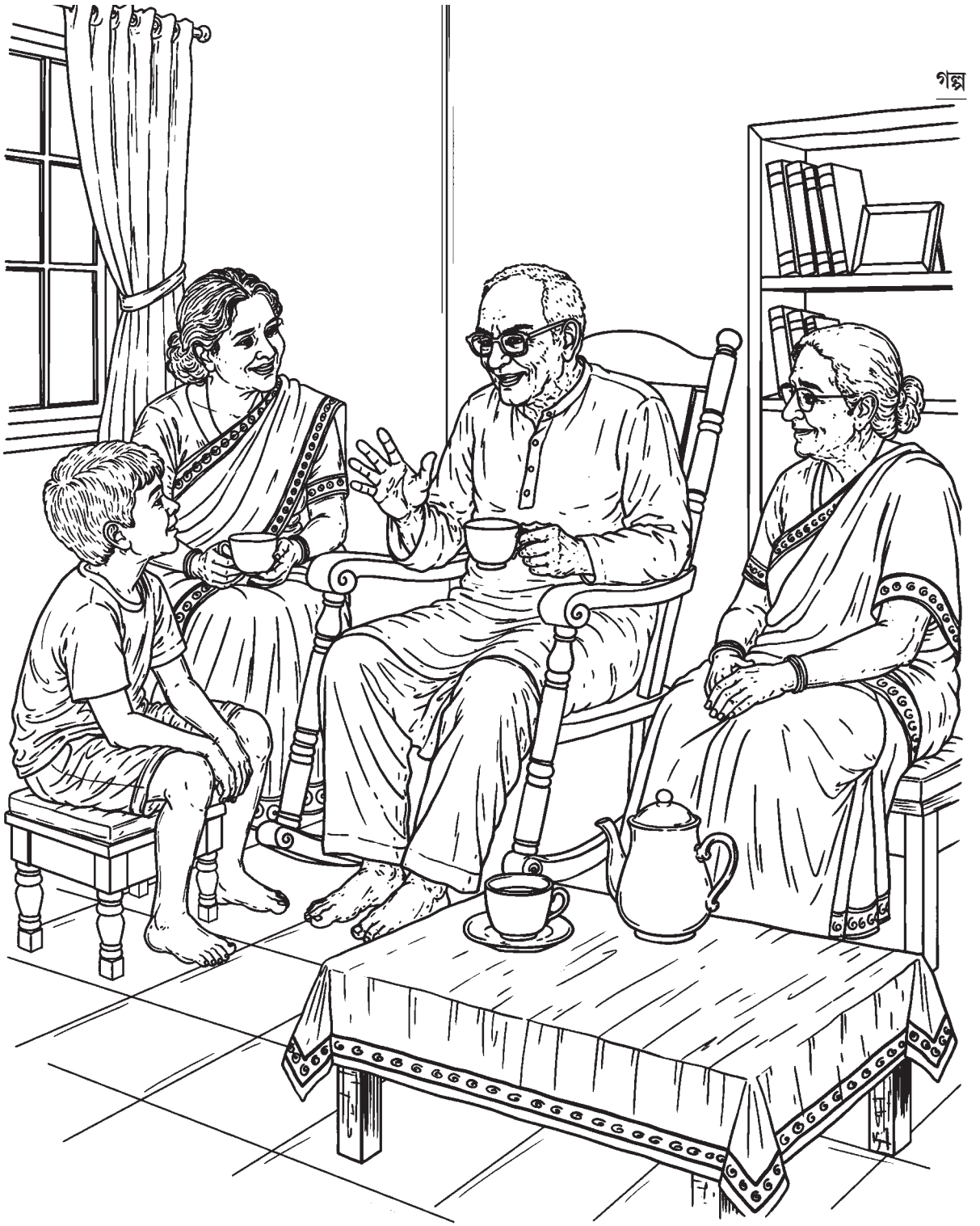
(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

(Stock Broker and Portfolio Manager Service)

LAURELMF FINMART PRIVATE LIMITED
(Member of Association of Mutual Funds in India)
MUTUAL FUND DISTRIBUTOR

JAIN BAID & CO.
(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001
Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com



ইংলিশ জেঠু—১৯৭১

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

সেদিন স্কুল ছুটি হবার পর টিউশন সেরে ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল। একে তো রাস্তায় জ্যাম তার উপর আজ স্যারের পড়ানোর পর গল্পের মুড এসে গিয়েছিল। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কত রকমারি এয়ার-ডিফেন্স সিস্টেম যে ব্যবহার করে তা স্যার না বললে জানতেই পারতাম না। পড়া শেষ হয়ে যাবার পর স্যারকে হঠাৎ-ই প্রশ্ন করেছিলাম আমরা। সুতরাং যা হবার তাই হলো। যথারীতি দেরি।

দমকলের স্টাইলে বেল বাজিয়ে বাড়ি ঢুকেই স্কুলের ব্যাগটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলতেই শুরু হলো মায়ের বকুনি।

''—ধাড়ি ছেলে! এ বাড়িতে কি সবাই কালা? এতবার বেল বাজাতে বারণ করেছি না। আবার বই এর ব্যাগ বিছানায় ছুঁড়ে ফেলেছিস। কেন, ঠিক জায়গায় রাখতে পারিস না?''

''খিদে পেয়েছে খেতে দাও, এত কথা বলার কী হয়েছে? সেই কখন স্কুলে টিফিন খেয়েছি।'' আমি ঝাঁঝিয়ে উঠতেই দাদুর গলা শুনতে পেলাম—''বৌমা ছেলেটাকে আর বকো না। সেই সকালে স্কুলে গেছে আর এখন ফিরল। হ্যাঁরে, আজ এত দেরি হলো।''

''আর বলো না দাদু, সারা রাস্তা জ্যাম।'' আর স্যার আজকে পড়ানোর পর সারা পৃথিবীর যত দেশ আছে তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে বলছিলেন। তাই দেরি হয়ে গেল।''

আমি হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিং-এ এলাম। নিনি অর্থাৎ আমার ঠাকুমা রুটি আর তরকারি আমার মুখে গুঁজে দিতে দিতে বলল—''অনেক দেরি হয়ে গেছে, একদম রাতের খাওয়া শেষ করে নে; আর বড়ো হচ্ছিস তো, এখন একটু দস্যিপনাটা কমা।''

সঙ্গে সঙ্গে মা-ও শুরু করল, আমি রাগ চেপে মনে মনে বললাম—''একজন বাঁয়া আর একজন তবলা।'' মুখ গোঁজ করে খেয়ে উঠে এলাম। ভেবেছিলাম, বাড়ি ফিরে দাদুকে সব গল্প করবো, কিন্তু পরিস্থিতিটাই পাল্টে গেল—কিছু ভালো লাগছে না— মনটাই বিস্বাদ হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরেই এমন একটা ঝড়ের মধ্যে পড়ে যাবো, এটা আশা করিনি। আসলে বড়োরা যখন বড়ো হয়ে যায় তখন ছোটোবেলাটা তাদের আর মনে থাকে না। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাবার ফিরতে এখনও একটু দেরি আছে। রাস্তার লাইটগুলোর দিকে চেয়ে আমি যখন প্রতিজ্ঞা করছি, বড়ো হয়ে গেলেও আমি ছোটোবেলাকে মনে রাখবো; ঠিক তখনই কানে এল দাদু ছড়া কাটছে—

'হুকোমুখো হ্যাংলা, বাড়ি তার বাংলা
মুখে তার হাসি নাই দেখেছ?'

দাদু আমাকেই হুকোমুখো বলছে নাকি। ভাবতেই খেয়াল হলো আরে, এ যে সুকুমার রায়। তাহলে দাদুর মন আবার কল্পনার আকাশে পাখা মেলেছে। দুই লাফে বারান্দা পেরিয়ে দাদুর ঘরে ঢুকেই দেখি, দাদু তার প্রিয় রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে ছড়া কাটছে।

''দাদু!''

''হ্যাঁ দাদু! তুমি যা ভাবছো তাই।'' দাদু মিটিমিটি করে হাসতে লাগলো।

''আমরাও কি বসতে পারি তোমাদের সঙ্গে?'' নিনি আর মা কখন যে একসঙ্গে ঘরে ঢুকেছে দেখতে পাইনি। মায়ের হাতে চায়ের কাপ। কাপটা নিতে নিতে দাদু বলল—''নিশ্চয়।''

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—''তোদের স্যার আজ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম নিয়ে কী কী বললো?''

ওই যে বিশ্বের প্রথম অপারেশনাল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাইকি আয়াক্স, তারপরেই সোভিয়েত ইউনিয়ানের S-75 Divina, ব্রিটেনের Shy Sabra, ফ্রান্সের Mamba, ফ্রান্স ও ইতালির যৌথ উদ্যোগে Sanpa/TNG, জার্মানির প্যাট্রিয়ট থেকে আরম্ভ করে আমেরিকার অত্যাধুনিক MIM-104 Patriot, THAAD, Aegis (AEGIS), রাশিয়ার S-400, S-500, ব্রিটেনের RAVEN System, ফ্রান্সের GM-403M, জার্মানির ARROW-3, Oertitron System, ইজরাইলের FRON DOME, ভারতের BHASKAR-8, S-400 Triny বা সুদর্শন চক্র এসব নিয়েই বলছিলেন।''

''বাঃ! তা এগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝেছিস তো?'' দাদু চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্নটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমি কিছু বলার আগেই নিনি মাকে বলে উঠলো।

''চল আমরা বরং টিভি দেখি। তোমার শ্বশুরমশাই বোধহয় আজ এসব করেই কাটাবে। দাদু আর নাতি ওদের জ্ঞানচর্চা নিয়ে থাকুক। নিনির গলায় হতাশার সুর। আমি যখন মনে মনে ভাবছি—''যাক, আপদ গেলো। এখানে থাকলেই আজে বাজে প্রশ্ন করবে, গল্প শোনাটাই হয়তো বাতিল হয়ে যাবে। তার আগেই দাদু বলে উঠলো—

''আচ্ছা সেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা তোমার মনে আছে?''

''না থাকার কী আছে?'' নিনিকে শেষ করতে না দিয়েই দাদু আবার বলল—''না, মানে তোমার ভাই যে কীর্তি করেছিল, সেটা তোমার মনে আছে?''

''সে তো একমাত্র সে আর তার পেয়ারের জামাইবাবু ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানতে পারে না। তা আজ কোন উপাখ্যান। আমার ছোটো ভাইটার কোন কীর্তির কথা তোমার মনে পড়লো?'' নিনির ছোট্ট খোঁচাটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দাদু বলল—''আরে না না। তোমার নাতি বলছিল ওর স্যার আজকে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বা অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্ট বা মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম মানে

ইজরায়েলের আয়রন ডোম, ভারতের সুদর্শন চক্র বা আমেরিকার থাড, এসবের যে কনসেপ্ট তা কিন্তু প্রথম আসে ভারতেরই মাথায়। আর সেটা প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে।"

''তাহলে তার আগে কী? এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বলে কিছু ছিল না?"—আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

''না না, অনেক আগে থেকেই ছিল অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্ট গান। আর প্রথম সারফেস টু এয়ার মিসাইল ১৯৫০ সালে তৈরি হয় Nibe Ajax। কিন্তু সবচেয়ে সস্তায় দেশীয় প্রযুক্তিতে একটা under developed country যে concept বাজারে এনেছিল এবং প্রমাণ করেছিল, তা আজ যতই আয়রন ডোম সুদর্শন চক্র বা থাড দেখাও না কেন ১৯৭১-এ ভারতের Kite System ছিল পথিকৃৎ। আজ যেমন এইসব সিস্টেম ক্র্যাক করা মুশকিল সেদিন ভারতের Kite System-কেও ফাঁকি দিয়ে কেউ পার পায়নি।"

''কিন্তু এর সঙ্গে আমার ভাইয়ের কী সম্পর্ক?" দাদুকে থামিয়ে দিয়ে নিনি প্রশ্ন করে বসলো। আমিও অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম—''সত্যিই তো দাদু, এর সঙ্গে ইংলিশ জেঠুর কী সম্পর্ক?"

''আছে আছে। এই রাডার ভিত্তিক ডিফেন্স সিস্টেমগুলো তৈরি করার আগে তোদের আমেরিকা, রাশিয়া, ইজরায়েল এরা কার সঙ্গে যোগাযোগ ও পরামর্শ করেছিল জানিস।

''আর যার সঙ্গে করুক না কেনো নিশ্চয় ইংলিশ জেঠুর সঙ্গে নয়। কোথায় বিশ্বের বড়ো বড়ো দেশ আর কোথায় ভারতবর্ষ। শুধু তাই নয় আবার ইংলিশ জেঠু। কোনোটার সঙ্গে কোনোটাই মিলছে না দাদু।"

তোরা জানিসই না যে এই প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়ার আগে মার্কিন, রাশিয়ান বা ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন খুব গোপনে ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় তোর বাবার মামার বাড়ি এসেছিল।

হ্যাঁ ঠিক তো, ওরা গভীর রাতে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপি চুপি আসতো আর সেটা আমরা বাড়ির লোকেরা কেউ কিছু না বুঝলেও একমাত্র তুমি আর তোমার শালা জানতে। যত্তো সব গাঁজাখুরি। নিনির বক্রোক্তির সঙ্গে সঙ্গে মা'র প্রশ্ন—''বাবা, এর সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কী সম্পর্ক?"

''সম্পর্ক আছে বৌমা।" নিনির বক্রোক্তিকে পাত্তা না দিয়ে মার প্রশ্নের উত্তর দিল দাদু। আসলে এই মুক্তিযুদ্ধ না হলে রাডার ভিত্তিক উন্নতমানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পৃথিবীর দেশগুলো হয়তো তেমন করে ভাবনাচিন্তা করতো না। আগেকার প্রায় সবকটি সিস্টেমই ছিল যুদ্ধবিমান বা ছোটোখাটো রকেট আটকানোর জন্য কিন্তু পরবর্তীতে যখন মিসাইল চলে এল তখন সেগুলো আটকানোর চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে বড়ো বড়ো দেশগুলো নজর দিল ১৯৭১ সালে ভারত এ ব্যাপারে কী করেছিল।

দাদু তুমি বললে ভারতের Kite System-এর সাফল্য পৃথিবীর দেশগুলোকে রাস্তা দেখিয়েছিল। Kite মানে তো ঘুড়ি।

ঠিক তাই। চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে দাদু ফের বলতে শুরু করলো।

তখন ১৯৭১ সাল। সারা বাংলাদেশ অর্থাৎ তখনকার পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের রেশ ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাভাষার মর্যাদা, বাঙ্গালির জাত্যভিমানকে রক্ষা করতে ওপার বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান একযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। যে প্রচণ্ড অত্যাচারের শিকার ওপার বাঙ্গলার মানুষদের পশ্চিম পাকিস্তানের খান সেনাদের দ্বারা হতে হয়েছে তা এখনকার ছেলে-মেয়েরা চিন্তা করতেও পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান সৈন্যরা আর তাদের পদলেহী পূর্বপাকিস্তানের কিছু লোক যাদের 'রাজাকার' বলে তারা মিলে পূর্ববঙ্গ জুড়ে বীভৎস অত্যাচার করছে। তখনো ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়নি, হবে হবে করছে। ভারতের বর্ডার এলাকাগুলো দিয়ে লাখে লাখে শরণার্থীর ঢল নেমেছে। পূর্ব-পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করার ষড়যন্ত্রে পশ্চিম পাকিস্তান পৈশাচিক খেলায় মেতে উঠেছে। এ সেই সময়ের কথা। একটানা এতগুলো কথা বলে দাদু একটু থামতেই তাড়া লাগালাম।

তারপর! দাদু ফের বলা শুরু করল—

তোদের ইংলিশ জেঠু তখন ২০-২২ বছরের যুবক। ভীষণ ঘুড়ি ওড়াতে ভালবাসত। ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেত একেবারে। নানান ধরনের ঘুড়ি আর লাটাইতে ওর ঘর ভরে থাকত। ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় ওকে হারানোর মতো লোক তখন পশ্চিমবঙ্গে খুব কমই ছিল। অন্যের ঘুড়ি কীভাবে কাটাতে হবে তার বিভিন্ন প্যাঁচ পয়জার ওর আয়ত্তে ছিল। শুধু তাই নয় এইসব প্যাঁচ পয়জার শেখার জন্য বহু ছেলে ছোকরা ওর কাছে আসত রীতিমতো গুরুদক্ষিণা প্রদান করে। ঘুড়ি ওড়ানো শেখানো ব্যাপারটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে ফেলেছিল তোদের ইংলিশ জেঠু। যারা ঘুড়ির ব্যবসা করতো তারা চাইতো তাদের ঘুড়ি প্রথম ওড়াক তোদের ইংলিশ জেঠু কারণ যে ঘুড়ি ও ওড়াবে সেই ঘুড়ির বিক্রি বাজারে সবচেয়ে বেশি হবে। এজন্য ইংলিশ জেঠু সম্মান দক্ষিণাও পেত।

তাহলে তো সরকার থেকেও ইংলিশ

জেঠুর এই প্রতিভাকে সম্মান জানানো উচিত ছিল। বললাম আমি। একটু চুপ করে দাদু কী একটা ভাবলো, তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললো—'বঙ্গীয় ঘুড়ি সমাজ' ওকে 'ঘুড়িশ্রী' উপাধি দিলেও সে সময় ভারত সরকার 'অর্জুন' পুরস্কার দেবে বলে ডেকেছিল ঠিক সেই সময়েই পূর্বপাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

কেন যুদ্ধের পরেও তো দেওয়া যেতে পারত? মা'র টিপ্পনী কাটার অভ্যাসটা আর গেল না। একদম নিনির মতো স্বভাব পেয়েছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে দাদু বলল—''সে চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। ১৯৮৫ সালে দ্রোণাচার্য পুরস্কার দেবার কথা উঠলে তোমাদের ইংলিশ জেঠুর সঠিক কোনটা পাওয়া উচিত 'অর্জুন' না 'দ্রোণাচার্য' সেই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। যে কারণে ১৯৯১-৯২ তে রাজীব খেলরত্ন ও ইংলিশ জেঠুকে দিতে পারা যায়নি।

এরপর নিনি কি আর চুপ করে থাকতে পারে। যথারীতি বলে বসলো—সম্পূর্ণ গুল! কারণ এগুলো কোনোদিন কোনোও খবরের কাগজ, টেলিভিশন বা রেডিয়োতে বলেনি এবং আমরা তার নিটকজনরাও কোনোদিন শুনিনি বা জানতে পারিনি।

একটা হাত তুলে নিনিকে থামিয়ে দিয়ে দাদু বলতে শুরু করল—''আরে জানবে কী করে, পুরোটাই তো সরকার মনে মনে ভাবছিল। দেবে কী দেবে না। দাদুর কথার ভঙ্গিতে আমরা সবাই হেসে ফেললাম। মুচকি হেসে দাদু শুরু করল—''ওই যে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছিলাম না। এই মুক্তিযুদ্ধে এপার বাঙ্গলার হাজার হাজার ছেলে মুক্তিযোদ্ধাদের হয়ে পূর্ববঙ্গকে স্বাধীন করার জন্য লড়াই করেছিল। তখনই যখন সরকারিভাবে ভারত যুদ্ধে নামল ঠিক সেই সময়ই ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মানেকশ-র মাথায় আসে তোদের ইংলিশ জেঠুর কথা। মনে রাখবি, সেই সময় ভারত কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের একটা অনুন্নত দেশ। এটা কিন্তু আজকের উন্নতশীল দেশ নয় বা অচিরে যে উন্নত দেশে পরিণত হবে তাও নয়। অনুন্নত থেকে উন্নতিশীল সেখান থেকে উন্নতদেশে পরিণত হতে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতকে একশো বছর পার হতে হবে, কারণ ইংরেজরা আমাদের সবকিছুই প্রায় শেষ করে দিয়ে গেছিল। একটু থেমে একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে দাদু বলল—''যাই হোক, সে সময় পাকিস্তানের তুলনায় এয়ার ডিফেন্স ভালো থাকলেও ভারত সরকার বা আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগ চাইছিল কেমন করে কম খরচে, প্লেন না উড়িয়ে অথবা অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট গানের গুলি খরচ না করেও পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানের প্লেনকে রুখে দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। তখনই জেনারেল মানেক্শ গোপনে শরণাপন্ন হলেন তোদের ইংলিশ জেঠুর। দেশের জন্য জীবন দিতে বা দেশের রক্ষার্থে কোনো কাজেই তো ইংলিশ জেঠু কোনদিনও পিছপা ছিল না; সুতরাং সে চলে গেল বর্ডারে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তা করার জন্য। তারপর তো ইতিহাস। মাত্র ১৩ দিনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান। তৈরি হলো স্বাধীন বাংলাদেশ।''

''তাতে ইংলিশ জেঠুর অবদান কী?'' আমি উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে উঠলাম।

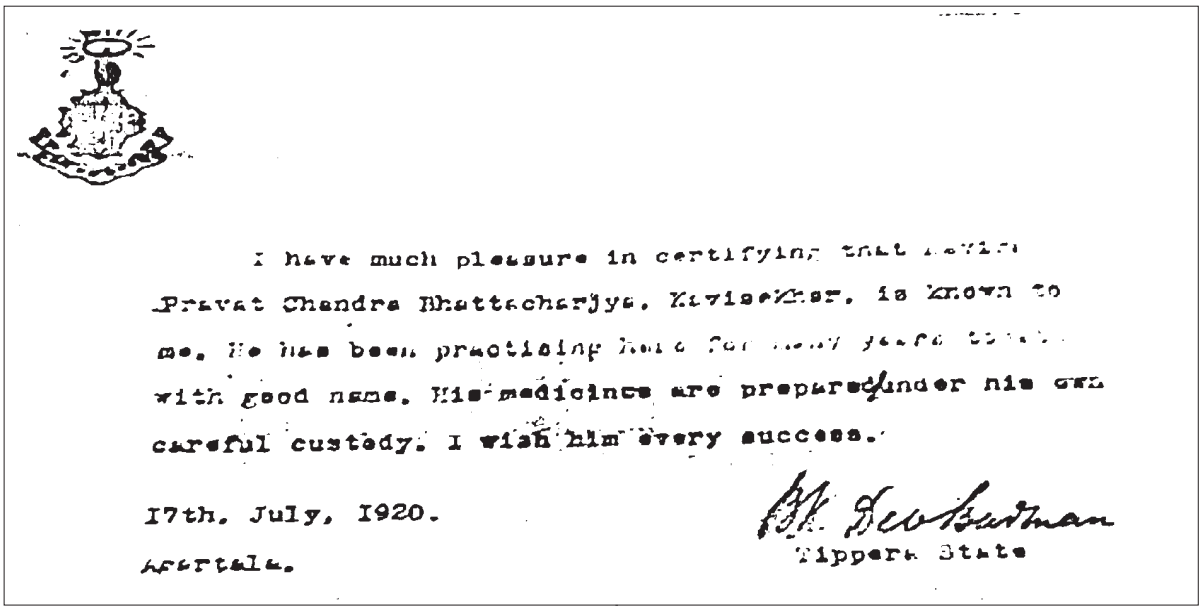
কেন রে, যতবার পাকিস্তানী প্লেন পূর্ব ভারতের বর্ডার ক্রস করতে গেছে ততবারই আকাশ ছেয়ে গেছে ঘুড়িতে ঘুড়িতে। আর সে কী ঘুড়ি। এক একটা সুতোর থেকে শাখায় শাখায় ঘুড়ি! যেদিকেই পাকিস্তানের প্লেন উড়তে চায় সেদিকেই ঘুড়ি! ইংলিশ জ্যেঠু আর তার সাকরেদরা বর্ডারের এপার থেকে ঘুড়ি উড়িয়ে পাকিস্তানের সব প্ল্যান বানচাল করে দিয়েছিল। তাই আকাশ যুদ্ধ ওরা আর করতে পারেনি, আর সেই সুযোগে আমাদের আর্মি ওদের গোহারান হারিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনাই পরে বড়ো বড়ো দেশগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বানাতে। যার ফলশ্রুতি চীনের HQ সিস্টেম, রাশিয়ার –S-500, আমেরিকার THAD, ইজরায়েলের IRON DOME বা ভারতের সুদর্শনচক্র। ভারতের সামরিক বাহিনী সবরকম সাহায্য করেছিল তোদের ইংলিশ জেঠুকে। এমনকী ওরা খুব কষ্টও পেয়েছিল যেহেতু সিভিল লোক বলে ওরা তোদের ইংলিশ জেঠুকে 'বীরচক্র' বা 'পরমবীর চক্র' দিতে পারেনি বলে। আর দেশের জন্য কাজ করে পুরস্কার নেবার মানসিকতাও তোদের ইংলিশ জেঠুর ছিল না। সে ছিল প্রকৃতই দেশ অন্তঃপ্রাণ। ভারতমাতাই তার সবকিছু। থামল দাদু। আমরা তিনজন সম্পূর্ণ স্তব্ধ। আমার সবকিছু কেমন যেন ঘুলিয়ে যেতে থাকলো। মা আর নিনি ঘরের বাইরে চলে গেল হাসতে হাসতে। দাদুর গলায় আবার সুকুমার রায়—

মাছি মারা ফন্দি-এ যতভাবি মন দিয়ে..... আর আমি? বসে রইলাম বিমূঢ় হয়ে। এবার রাতটাই বোধ হয় ভেবে ভেবে কেটে যাবে হুঁকোমুখোর দিনটা যেমন কেটেছিল।

ত্রিপুরা রাজ্য—সেকাল একাল

গৌতম দেবনাথ

উত্তরপূর্ব ভারতের ছোট পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা। আশির দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছি বহুবার। ত্রিপুরা বললে অনেকেই চিনতে পারত না। আগরতলা বললে আগরপাড়ার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলত। বছর কুড়ি আগে হায়দরাবাদে এক সেমিনারে একজন মহিলা সিনিয়র পুলিশ অফিসার আমাকে



I have much pleasure in certifying that Babu
Pravat Chandra Bhattacharjya, Kaviratnar, is known to
me. He has been practising here for many years with
with good name. His medicines are prepared under his own
careful custody. I wish him every success.

17th. July, 1920.
Agartala.

Tippera State

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্য কেরালায় কি না। আমি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে শুধরে দিয়েছিলাম যে ত্রিপুরা কেরালায় নয়, কর্ণাটকে। সম্ভবত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সে সেমিনারটি হয়েছিল। একজন অভিজ্ঞ আই.এ.এস. মিঃ সিনহা ছিলেন ডাইরেক্টর। ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রামে দু মিনিট বলতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের তথাকথিত উগ্রপন্থী সমস্যার কারণ বোধ হয় এ ধরনের উন্নাসিকতা। মিঃ সিন্‌হা আমাকে জড়িয়ে ধরে পরিষ্কার বাংলায় ভূতপুর্ব মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর প্রশাসনিক দক্ষতার প্রসংশা করে আমার ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরকে গুরুত্ব না দেওয়াও ত্রিপুরার পরিচিতির অভাবের জন্য সমানভাবে দায়ী ছিল। অথচ ত্রিপুরার অপার প্রাকৃতির সৌন্দর্য ছাড়াও অনেক আকর্ষণীয় স্থান রয়েছে যা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হবে। যদিও সে সময় রেললাইন ছিল না। কিন্তু আকাশ পথে যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া ডোমেস্টিক টুরিজম্‌ও অবহেলিত ছিল। গত দশ বছরে ভারত সরকার ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর- পূর্বাঞ্চলে রেল সম্প্রসারণ-সহ পর্যটন শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। ত্রিপুরা এখন টুরিজম্‌ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছে।

রাজন্য ত্রিপুরা ঃ মহারাজা ধন্যমাণিক্যের সভাপণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর 'রাজমালা' রচনা করার সময় তৎকালীন ত্রিপুরার ভৌগোলিক সীমা বর্ণনা করেছিলেন এভাবে—

'কিরাতনগরে রাজা বিধির গঠন।

রাজ্যের সীমানা কহি শুনহ বচন।।
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী, দক্ষিণে রসাঙ্গ।
পূর্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কাচবঙ্গ।।
ত্রিবেগ স্থানেতে রাজা করিল এক পুরী।
নানামত নির্ম্মাইল পুরীর চত্তারী।'

'রসাঙ্গ' (আরাকান) 'মেখলি' (মণিপুর) পশ্চিমে রাজ্যের সীমা ছিল বঙ্গের সংলগ্ন। সভাপণ্ডিত শুক্রেশ্বর এবং বাণেশ্বর প্রণীত রাজমালা বহুল প্রচলিত নয়। পরবর্তী সময়ে কৈলাশ চন্দ্র সিংহ প্রণীত 'রাজমালা'য় আধুনিক ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরার মহারাজাদের পরিচিতি অনেক বেশি প্রচলিত এবং সেকারণে তা সমাদৃত। অন্যান্য মহারাজদের সময় ও রাজমালার কয়েক খণ্ড লেখা হয়েছিল। কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পরিবার পুরুষানুক্রমে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে রাজকার্যে জড়িত ছিলেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে কৈলাশ চন্দ্র সিংহ রাজকার্যে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও অল্পকয়েক বছরের মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।

মহারাজা ঈশান চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে সে সময়ের সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং সে বিরোধ ব্রিটিশ আদালতে গড়ায়। কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয় কুমার বাহাদুর নবদ্বীপ চন্দ্রের পক্ষে মোকদ্দমা দেখভাল করেছিলেন। আদালতের রায়ে কুমার বাহাদুর নবদ্বীপ চন্দ্র হেরে যান। তৎকালীন ত্রিপুরার চাকলা রোশনাবাদ হিসাবে পরিচিত অর্থাৎ কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, পার্বত্য চট্টগ্রাম যা বর্তমানে বাংলাদেশের অংশ। কুমিল্লায় তার বংশধর পরবর্তী সময়ে পৃথিবী বিখ্যাত শচীন দেববর্মন এবং তার সুযোগ্য পুত্র রাহুল দেববর্মন বসবাস করতেন। রাহুল দেববর্মন ছাত্র জীবনের কয়েকবছর কলকাতায় ছিলেন। তাঁদের একটা বাড়িও কলকাতায় ছিল। শচীন দেববর্মন কিছুসময় কলকাতায় কাটালেও কোনোভাবেই তাঁকে কলকাতার বাসিন্দা বলা যায় না। তাঁরা ত্রিপুরার ভূমিপুত্র। বছর দুয়েক আগে আগরতলার লিচুবাগান অঞ্চলে শচীন দেববর্মনের একটি মূর্তি বসানো হয়েছে।

অবিভক্ত বাংলার পাঁচটি বিভাগ ছিল অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি বিভাগ (কলকাতা), বর্ধমান বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত ছিল নোয়াখালি ও ত্রিপুরা।

ত্রিপুরার রাজসিংহাসন অষ্টকোণ এবং ষোড়শ সিংহ। ৯টি রাজকীয় প্রধান চিহ্ন। তাছাড়া আছে কিছু উপচিহ্ন। (সূত্র কৈলাশ চন্দ্র সিংহ—রাজমালা)

রাধাকিশোর মাণিক্য ১৮৯৭-১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা থাকাকালীন গভীরভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কাছ থেকে ত্রিপুরার রাজপরিবারের অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করে 'রাজর্ষি' উপন্যাস এবং 'বিসর্জন' ও 'মুকুট' নামে দুটি নাটক লিখেছিলেন। তাছাড়া সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মহারাজ বীরচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন। তখনো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরায় আসেননি। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম দেখা হয় পশ্চিমবঙ্গের কার্সিয়াঙে। বীরচন্দ্র মাণিক্য বাংলা ভাষায় কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য হল 'অকাল কুসুম', 'প্রেমমরীচিকা', 'ঝুলন' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগরতলার উমাকান্ত স্কুলে চারবার এসেছিলেন। সম্ভাব্য তারিখ ১ জুলাই ১৯০৫, ১০ নভেম্বর ১৯০৫, ৯ নভেম্বর ১৯১৯। সেদিন তিনি স্কুলের পরিদর্শন পুস্তকে স্বাক্ষর করেছিলেন। আরেকবার এসেছিলেন ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬। ১৮৯৮ সালে মহারানি তুলসীবতী স্কুল প্রতিষ্ঠাকালেও এসেছিলেন বলে কিছু অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে ত্রিপুরার মহারাজা প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

ত্রিপুরার মহারাজদের সিংহাসন ও প্রচলিত মুদ্রা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া সম্ভব যে তাঁরা ছিলেন চিরাচরিতভাবে হিন্দু। যদিও মুসলমান এমনকী কিছু খ্রিস্টানও এ রাজ্যে ছিলেন। মহারাজারা ছিলেন ধর্মীয়ভাবে খুবই উদার।

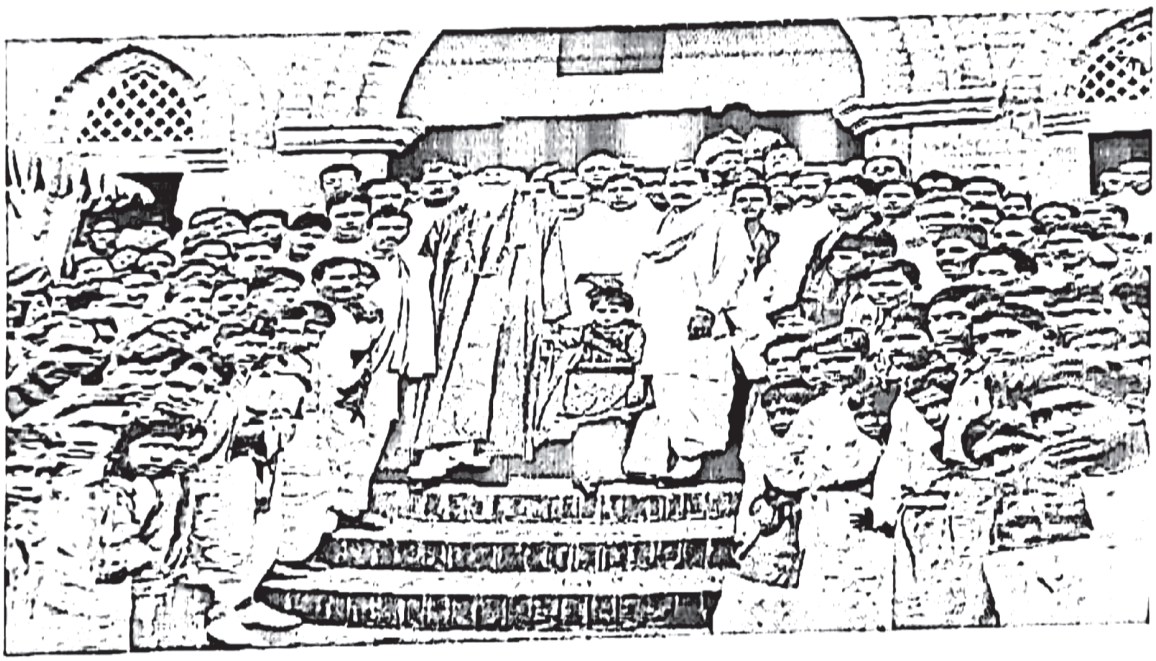
ত্রিপুরার রাজকার্য ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ত্রিপুরার রাজকার্য বাংলা ভাষায় পরিচালিত হতো। সেজন্য সাহিত্যের উন্নতিও হয়েছিল। প্রমাণ হিসাবে রাজপণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর মহোদয়ের লিখিত 'রাজমালা' বা কৈলাশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের 'রাজমালা' বাংলা ভাষায় লিখিত এবং হরফও বাংলা। এছাড়াও অন্যান্য মহারাজদের সময়েও রাজমালার বিভিন্ন খণ্ড লেখা হয়েছিল বাংলা হরফে।

আধুনিক ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। প্রামাণ্য দলিল হিসাবে তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত মহাশয়ের ১৩৮৯ সালের লেখা 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপুরার স্মৃতি' বেশ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এ প্রবন্ধের অনেক তথ্য সে বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও মূলত তিনি শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একজন অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন তিনি।

১৯৪৭ সালে মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন যে স্বাধীন ত্রিপুরা ভারতভুক্ত হবে তাহলে চাকলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রিপুরা সফরে উমাকান্ত একাডেমিতে কিশোর সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।



রোশনাবাদ অর্থাৎ কুমিল্লা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট জেলা-সহ যে সুবিশাল অংশ এখন বাংলাদেশভুক্ত তা ভারতের অংশ হতেও পারত। যে অঞ্চলে ত্রিপুরার মহারাজদের জমিদারি ছিল, সে অঞ্চল থেকে ত্রিপুরার মহারাজরা খাজনা আদায় করতেন। মুঘল আমল থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। চাকলা রোশনাবাদের তালুকদাররা সে অঞ্চলের শাসন কার্যের ব্যয়ভার বহন করেও ত্রিপুরার মহারাজদের ১,৫০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত রাজস্ব দিতেন যা ত্রিপুরার বাজেটে যুক্ত হতো। তৎকালীন ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধাচারণ করে ত্রিপুরার বিশেষ ব্যক্তিত্ব হরিগঙ্গা বসাক কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ পাঠাতেন সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে। ফলে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর হরিগঙ্গা বসাক তাঁর ঢাকার বাড়িতে গেলে গ্রেপ্তার হয়ে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে মৃত্যুবরণ করেন। আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে হরিগঙ্গা বসাক রোড।

ত্রিপুরা পর্বতমালা ও নদী ঃ নদীকে কেন্দ্র করেই জনবসতি গড়ে ওঠে। ত্রিপুরাও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রধান নদী গোমতি ও মনু। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা হাওড়া নদীর তীরে অবস্থিত। আসলে যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদির কারণে আগরতলায় ত্রিপুরার রাজধানী বহু পরে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ নামে খ্যাত রাজবাড়ি ত্রিপুরা সরকারের অধীনে ত্রিপুরার জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। তার আগে পুরানো অর্থাৎ খয়েরপুর অঞ্চলে ছিল রাজবাড়ি। বস্তুত পক্ষে ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে প্রথম রাজধানী জাম্বুল নগর যা উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর আর কৈলাশহর অঞ্চলের মাঝামাঝি অঞ্চলে ছিল। তারপর অমরপুর, উদয়পুর বা রাঙামাটি ছিল ত্রিপুরার রাজধানী। একাধিকবার রাজধানী পরিবর্তনের কারণ যুদ্ধবিগ্রহ বা বহিশত্রুর আক্রমণ। তাছাড়া ফেনি, মুহুরি নদী এবং এসব নদী থেকে সৃষ্ট বেশ কিছু উপনদী ঘিরে জনপদ গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে দেশভাগের পর চাকলা রোশনাবাদ থেকে স্থানান্তরিত বাঙালিরা বসতি স্থাপন করেন এবং পতিত জমিকে শস্যভাণ্ডার হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। দেশভাগের পর চাক্‌লা রোশনাবাদের বাঙালিদের ভৌগোলিকভাবে স্বাভাবিক গন্তব্য স্থল ছিল ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও অসম। সিএএ আইন পাশ করার

সময় ত্রিপুরা রাজ্যকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে জনবিন্যাস পরিবর্তনের প্রশ্নে।

ত্রিপুরার পর্বতশ্রেণী পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে বন্যহাতি এখনো বড়মুড়া, আঠারমুড়া পর্যন্ত মাঝে মাঝেই আসা যাওয়া করে। তাছাড়া ভাল্লুক, বিভিন্ন প্রজাতির বন বিড়াল, বানর, বিশেষত চশমা বানর যা ত্রিপুরা রাজ্যেই শুধুমাত্র পাওয়া যায়। এছাড়া অসংখ্য প্রজাতির হরিণ, বন্যমহিষ ত্রিপুরার অন্যতম বন্য প্রাণী।

১৯৪৮ সালে আগরতলায় নেতাজী স্কুল, ১৯৫০ সালে আগরতলায় গান্ধীস্কুল, ১৯৫১ সালে উদয়পুরে রমেশ স্কুল সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের প্রয়োজনেই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত প্রসার শুরু হয়েছিল। যার প্রভাবে পাহাড়ি অঞ্চলের উপজাতি যুবকরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার তাগিদ অনুভব করে এবং স্কুলের বোর্ডিং হাউস থেকে পড়াশোনা করা শুরু করে।

১৯৪৭ সালে আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ চালু হলেও বস্তুতপক্ষে তার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। এ কলেজে সাধারণ ডিগ্রি ছাড়াও কারিগরি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি চালু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু মহারাজ বীরবিক্রমের ৩৯ বছর বয়সে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অকাল প্রয়াণ এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে নির্মীয়মান কলেজ চলে যায় সেনাবাহিনীর দখলে। তাছাড়া কৈলাশহরে কিছু বর্ধিষ্ণু মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য তাপস চৈতন্য মহারাজের উদ্যোগে কৈলাশহরে আর.কে.এস.পি স্কুল এবং মহাবিদ্যালয়ের স্থাপন হয়েছিল ১৯৫০ সালে। কাজেই গত শতকের পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙ্গালিদের অধিক সংখ্যায় আগমনের ফলে ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত খুলেছিল তা সংশয়াতীত।

বর্তমানে ত্রিপুরার এন.আই.টি, তিনটি মেডিকেল কলেজ, ন্যাশন্যাল ল ইউনিভার্সিটি-সহ বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ রাজন্য ত্রিপুরা ছিল মূলত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা নির্ভর। শ্রী প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য্য ছিলেন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব যাঁর নামেও আগরতলায় প্রভাত মার্কেট হয়েছে। ১৭ জুলাই ১৯২০ সালে মহারাজ বীর বিক্রমের প্রভাতবাবুকে দেওয়া

With Best Compliments from -

Ganpati Laminators

&

Packagers Pvt. Ltd.

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

সার্টিফিকেট নিম্নরূপ— (সার্টিফিকেটের ছবি)

বাসন্তী ঔষধালয় ১৮৯৩ সালে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করেন কবিরাজ নবকুমার ভট্টাচার্য্য। ১৯৪৬ সালে আগরতলায় তা স্থানান্তরিত হয় এবং বর্তমানেও ডাঃ পি ভট্টাচার্য্য ওই বাসন্তী ঔষধালয় চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাজনীতি ঃ বিশেষত গত শতাব্দীর চার এর দশকের শেষ দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সময়। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব ত্রিপুরা রাজ্যেও পড়েছিল। উমেশ চন্দ্র সিংহ, শচীন্দ্র লাল সিংহ, অঘোর দেববর্মন, বীরেন দত্ত প্রমুখ প্রজাদের অধিকার আদায়ে একসঙ্গে আন্দোলন করলেও পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট ভাবধারার আকর্ষণে অঘোর বাবু, বীরেনবাবুরা মূলত পাহাড়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন। পাহাড়ের কুড়িটা সিটের মধ্যে প্রায় সবকটি দীর্ঘদিন তাঁদের দখলেই ছিল। যদিও বর্তমানে শূন্য। গত শতকের সত্তরের দশকে পাহাড়ের উপজাতি সমাজের নিজস্ব নেতৃত্ব তৈরি করার তাগিদে টি.ইউ.জে.এস তৈরি হয় এবং সাফল্যও পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আই.এন.পিটি.এন.এস,পি.টি আই, পি.এফ.টি ইত্যাদি দল হয়ে বর্তমানে তিপ্রা মথা দলের আত্মপ্রকাশ হয়েছে ত্রিপুরার রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে। বর্তমানে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তিপ্রা মথার দখলে আছে।



রবিঠাকুর ও ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য

ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অধীনে বর্তমানে ৫৮৬টি ভিলেজ কমিটি আছে। ১৯৮২ সালে সংবিধানের ৭ম তফশীলির অধীনে টি.টি.এ.এ.ডি.সি গঠিত হয়ে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ছিল। ১৯৮৫ সালে তা সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলভুক্ত হয়। টি.টি.এ.এ.ডি.সি-এর আয়তন প্রায় ৭১৩২ স্কোয়ার কিঃমিঃ। উপজাতি ভিত্তিক দলগুলো জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য টি.টি.এ.এ.ডি.সি-এর অধিক ক্ষমতার দাবি করে আসছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের ক্লাব সংস্কৃতি ঃ ১৯২৭-২৮ সালে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণায় আগরতলায় লালবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়িতে 'ছাত্র সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোরা খেলা, লাঠি খেলা বিভিন্ন ব্যায়াম ইত্যাদির প্রভাব বিস্তার হয়। পরবর্তী সময়ে ছাত্র সঙ্ঘ ভেঙে ভ্রাতৃসংঘ নামে অপর একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ছাত্র সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমানে আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মধ্যপাড়া অঞ্চলে, এরপর বিভিন্ন পাড়ায় অন্যান্য ক্লাব গড়ে উঠে। এই ক্লাবগুলো ব্যায়াম প্রদর্শনের দ্বারা মহারাজার আনুকূল্য লাভের প্রচেষ্টা করত। মহারাজা বীরবিক্রম কোনো কোনো সময়ে এসব প্রদর্শনীতে সশরীরে উপস্থিত থেকে উৎসাহ প্রদান করতেন। ক্রমশই ক্লাবগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। অল্পকিছু বছর মাতৃসঙ্ঘ নামে আরও একটি ক্লাবের জন্ম হয়। ভ্রাতৃসংঘ মেয়েদের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল এবং সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এরপর বিভিন্ন এলাকায় আরও অনেক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

খেলাধুলা ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ছেলেরা সারাভারতে দাপিয়ে ফুটবল খেলছে। ত্রিপুরার পাহাড়ি ছেলেদের অফুরন্ত দম থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিকাঠামো ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পিছিয়ে রয়েছে। মধুমানিক লোধ ও আর্জন আলি নামে দুজন ফুটবলার নিজেদের উদ্যোগে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে ফুটবল খেলেছিল। একই অবস্থা ক্রিকেটে। প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ত্রিপুরায় কোনো আই.পি.এল হয় না। কিন্তু জিমনাস্টিকে ১৯৬৯ সালে শ্রী মন্টু দেবনাথ মস্কো অলিম্পিকে ভারতের হয়ে সোনার পদক জিতেছিলেন। মন্টু দেবনাথ স্যারের সঙ্গে কদিন আগেও আমি কথা বলেছি। তাছাড়া দীপা কর্মকার ভারতের একমাত্র মেয়ে জিমনাস্ট অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে প্রদোনভা ভল্টের মতো কঠিন ভল্ট সফলতার সঙ্গে দিয়েছেন। শুধুমাত্র ল্যান্ডিং-এ সামান্য গণ্ডগোল হওয়ায় চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিলেন। ত্রিপুরার ভূমিপুত্র সোমদেব দেববর্মা টেনিসে ভারত এমনকী বিশ্বেও পরিচিত নাম।

পর্যটন ঃ অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পর্যটনের বহু স্থান থাকা সত্ত্বেও পূর্বতন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির দীনতায় ত্রিপুরা পর্যটনে পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার পর্যটনে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা পর্যটনে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

মাতাবাড়ী ঃ একান্ন পীঠের এক পীঠ মাতাবাড়ী বা ত্রিপুরা

সুন্দরী মন্দির উদয়পুরে অবস্থিত। বর্তমান সরকার মাতাবাড়ীর প্রভূত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে পর্যটক-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির কারণে পর্যটনের অন্যতম স্থান হয়ে উঠেছে। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা ধন্যমাণিক্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নীরমহল ঃ ভারতের সবচেয়ে বড়ো ওয়াটার প্যালেস নীরমহল ১৯৩০ সালে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য তৈরি করেছিলেন। আগরতলা থেকে যা ৫৩ কিলোমিটার দূরে মেলাঘরে অবস্থিত। বর্তমানে তার আমূল সংস্কার করা হয়েছে। দেখতে অপূর্ব সুন্দর।

জম্পুই হিলস্ ঃ চিরবসন্তের জায়গা জম্পুই হিলস্ উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে। আগরতলা থেকে ২২০ কি. মি.দুরত্বে টুরিস্ট লজ আছে। বর্তমানে অনেক হোম স্টে আছে। একরাত কাটালে 'মনে হয় স্বর্গে আছি'।

ছবিমূরা ঃ অমরপুরের ছবিমুরা আগরতলা থেকে প্রায় ৮৭ কিলোমিটার। নৌকায় বসে শিব, বিষ্ণু, কার্তিক, দুর্গাদেবীর মূর্তি পাহাড়ে খোদাই করা দেখতে পাওয়া যায়। এযেন নৌকায় করে আমাজনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো।

ডুম্বর লেইক অমরপুর ঃ প্রায় ৪১ কিলোমিটার জলাভূমির মধ্যে অসংখ্য দ্বীপ। অন্যতম দ্বীপ নারকেলকুঞ্জ। অনেক লগ্ হাট তৈরি হয়েছে। একটা রাত কাটালে ভ্রমণ পিপাসা মিটবেই। এ আমার অঙ্গীকার। আগরতলা থেকে দূরত্ব ১২৫ কিলোমিটার। একেবারেই মিস্ করবেন না।

সিপাহিজলা ঃ আগরতলা শহর থেকে মাত্র ২৮ কিলোমিটার দূরত্বে প্রায় ১৯ স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে এই অভয়ারণ্যে এক বেলা কাটালে পয়সার উশুল হবেই হবে। থাকারও ব্যবস্থা আছে।

কমলাসাগর ঃ আগরতলা থেকে ৩০/৪০ মিনিটের রাস্তা। বাংলাদেশ সংলগ্ন এই মন্দির দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে পারলে মন্দ হয় না।

উনকোটি ঃ আগরতলা থেকে প্রায় ১৮৬ কিলোমিটার দূরত্ব ৭ম থেকে ৮ম শতাব্দীতে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা বিভিন্ন শিবমূর্তি। এছাড়া রয়েছে আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, চতুর্দশ দেবতার মন্দির, মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ ও সংলগ্ন লেইক পার্ক। এক সন্ধ্যা অবশ্যই এখানে বেড়াতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশে এতবড়ো এলাকা নিয়ে এত সুন্দর কলেজ ও পার্ক ভারতে আছে বলে মনে হয় না।

থাকার ব্যবস্থা ঃ উল্লেখিত প্রত্যেকটি স্থানে সরকারি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। গুগুলে সব পেয়ে যাবেন। অনলাইন বুকিং করে নেওয়া ভালো। তাছাড়া রয়েছে বেসরকারি হোটেল।

পর্যটকদের সুবিধার জন্য আমি একটি টুরিস্ট গাইড তৈরি করে দিলাম।

রেল বা বিমানে আগরতলা অবতরণ করলে অনুভব করবেন যে একটা সুন্দর রাজ্যে বেড়াতে এসেছেন। গ্যারান্টি দিয়ে রাখলাম। সেদিনটি আগরতলা শহরের চতুর্দশ দেবতার মন্দির-সহ অন্যান্য স্থানগুলি যা উল্লেখ করেছি তা ঘুরে কাটিয়ে দিন। তবে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ দেখতে হবে দিনের বেলায়। টিকিট ৫০ টাকা। আর অফিস টাইমে ত্রিপুরা সরকারের পরিচালিত 'পূর্বাশা' ত্রিপুরা সিল্কের কাপড় এবং অন্যান্য কুটির শিল্প কেনাকাটা করতে পারেন। বিভিন্ন শপিং মল না হয় সেদিনের জন্য বাকি থাক। পরের দিন সকালে স্নান সেরে জল খাবার খেয়ে ৯টার মধ্যে বেরিয়ে যাবেন প্রথমে কমলাসাগর কালী মন্দিরে। সেখান থেকে সিপাহিজলা ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটিয়ে চলে যান নীরমহল। নৌকা দিয়ে নীড়মহল ভ্রমণ করে চলে যাবে উদয়পুর। সে রাতটা উদয়পুরে থেকে যাবেন। মাতাবাড়ীতে গুণবতী গেস্ট হাউস বা শহরের কয়েকটা হোটেলে থাকতে পারেন। তবে উদয়পুর থাকার সেরা জায়গা কিন্তু টেপানিয়া ইকো পার্ক। ২৫০০ টাকায় ডাবল প্রিমিয়ার বেড্ রুম আছে ২টি, তিনটি লগ্ হাট এবং দুটি ট্রি হাউস। অনলাইন বুকিং করে যাবেন। পরের দিন মাতাবাড়ী মন্দিরে পূজা দিয়ে অমরপুরের ছবিমুড়া দেখে দুপুরের খাবার খেয়ে সন্ধ্যার আগে পৌঁছে যান ডম্বুর। অন্ লাইন বুকিং করে যাবেন। বেশ কিছু রির্সট আছে। একটি মায়াবী রাত কাটিয়ে পরের দিন জল খাবার খেয়ে চলে আসুন আগরতলা।

এক রাত কাটিয়ে পরের দিন ট্রেনে করে পেঁচার থল স্টেশনে নেমে গাড়ি নিয়ে চলে যান চিরবসন্তের জায়গা জম্পুই হিলস্। অন লাইন বুকিং করে 'ইডেন' এ থাকুন অথবা হোমস্টে ও অনেক আছে। ঘুরে বেড়ান পাহাড়ে। সন্ধ্যায় অনতিদূরের মিজোরামের পাহাড়ের সৌন্দর্যও উপভোগ করতে পারবেন। জম্পুই হিলসে সন্ধ্যার সৌন্দর্য আপনাকে মোহিত করবেই। সম্ভব হলে পরের দিন উনকোটি দেখে ট্রেনে বা নিজস্ব ভাড়া গাড়ি করে চলে আসুন আগরতলা। আত্মীয়তা অনুভূত হলে আরও দিন দুয়েক ঘুরে কাটান না ঐতিহাসিক শহর আগরতলা। বিভিন্ন মলে শপিং করতে পারেন। আগরতলা থেকে সরাসরি বিমান যায় গৌহাটি, কোলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও চেন্নাই। রেলতো আছেই। নিমন্ত্রণ রইল।